ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

(ফররুখ-গবেষণা ফাউন্ডেশনের মুখপত্র)

চব্বিশতম সংকলন, অক্টোবর-২০১২

সম্পাদক

মুহম্মদ মতিউর রহমান

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

ফররুখ-গবেষণা ফাউন্ডেশনের মুখপত্র

(রেজিঃ নং- এস ৫৪৩৪ (৫৪৯)/ ২০০৬)

চব্বিশতম সংকলন , অক্টোবর-২০১২

সম্পাদক
মুহম্মদ মতিউর রহমান

সহকারী সম্পাদক
মহিউদ্দীন আকবর

প্রকাশক
ফর্‌রুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের পক্ষে
আবুল কালাম আযাদ

যোগাযোগ : ৬২/১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ০১৮১৯৪২০৪৮৯
Website: www.farrukhfoundation.net.org.

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
সৈয়দ মুহাম্মদ আলী (বাবুল)

প্রচ্ছদ
মহিউদ্দীন আকবর

কম্পিউটার কম্পোজ
মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম
মোহাম্মদ আরিফ হোসেন সোহাগ

মুদ্রণ
এ্যাঞ্জেল প্রেস, ৫ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য- পঁচিশ টাকা মাত্র

Farrukh Academy Patrika
(A periodical of Farrukh Gabeshana Foundation).
Edited by : **Muhammad Matiur Rahman**, President, Farrukh Gabeshana Foundation. Published by : **Abul Kalam Azad**, on behalf of the Farrukh Gabeshana Foundation. 24th Issue, October 2012.

প্রসঙ্গ কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। ফররুখ একাডেমী পত্রিকার চব্বিশতম সংকলন প্রকাশিত হলো। নানা অসুবিধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত এতগুলো সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শোকরগোজার করছি। এজন্য বিশেষভাবে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ফররুখ চর্চার ক্ষেত্রে ফররুখ একাডেমী পত্রিকার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এ পত্রিকার মাধ্যমে আমরা ফররুখ-কেন্দ্রিক চিন্তা-গবেষণা ও সৃজনশীল চর্চার একটি সুস্থ পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। প্রবীণদের ছাড়াও এক্ষেত্রে তরুণ ও নবীন গবেষকদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রাণময় উদ্দীপনা সঞ্চারিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করছি। ফররুখ চর্চার এ ধারাকে সংহত করার উদ্দেশ্যে আমরা এযাবৎ ফররুখ একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচিত সমৃদ্ধ লেখা নিয়ে একটি বৃহদাকার সংকলন প্রকাশের আয়োজন সম্পন্ন করেছি। আশাকরি, এটি শীগ্রই প্রকাশিত হবে এবং ফররুখ চর্চার ক্ষেত্রে এটা একটি মূল্যবান মাইলফলক হিসাবে পরিগণিত হবে।

ফররুখ আহমদ তাঁর জীবনকালে যতটা জনপ্রিয় ও অন্যদের নিকট অনুপ্রেরণা-সঞ্চারী প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর সে ধারা বেশি দিন অব্যাহত থাকেনি। ফররুখের রচিত গ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্যতা এবং একটি বিশেষ মহলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি তরুণ প্রজন্ম থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯৯৮ সনে ফররুখ একাডেমী (পরবর্তীতে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠার পর আমাদের ক্ষুদ্র অথচ নিরলস চেষ্টার ফলে আমরা সে বিচ্ছিন্নতা বা দুরত্ব কিছুটা হলেও কমাতে সক্ষম হয়েছি বলে আল্লাহর অশেষ শোকরগোজার করছি। তবে এক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষত তাঁর গ্রন্থাদি অবিলম্বে প্রকাশ ও তা সকলের জন্য সহজলভ্য করা এবং শিক্ষার সর্বস্তরে ফররুখ আহমদকে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা সময়ের অপরিহার্য দাবি।

ফররুখ বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার নাম। কোনভাবেই তাঁকে বিস্মরণের অন্তরালে ঠেলে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি তাঁর আপন শক্তিমত্তা ও অসাধারণ কাব্য-কুশলতার জন্যই চির অমর হয়ে থাকবেন। তাছাড়া, ফররুখ বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শ, দীর্ঘ লালিত ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিমান কবি। তাই তাঁকে উপেক্ষা করা অনেকটা আত্মঘাতির নামান্তর। এক্ষেত্রে কুয়াষার কালো মেঘ অচিরেই তিরোহিত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মুহম্মদ মতিউর রহমান
সভাপতি, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন

সূচীপত্র

ফররুখের হাতেম তা'য়ী ৫
আবুল কালাম শামসুদ্দীন
প্রেমিক ফর্‌রুখ ১০
আবদুল আহাদ
অভিভাষণ ১৪
প্রফেসর জিলণ্ডর রহমান সিদ্দিকী
ফররুখ কাব্যপাঠ: কিছু সমস্যা ২১
ডক্টর সদর-দ্দিন আহমেদ
কবি ফররুখ আহমদ, এক ব্যতিক্রমী কবি ২৫
জুবাইদা গুলশান আরা
ফররুখ আহমদের গীতিনাট্যঃ আনারকলি ৩১
মুহম্মদ মতিউর রহমান
শিশু-সাহিত্যর প্রিয় কবি ফর্‌রুখ আহমদ ৪৬
আশরাফ জামান
ফররুখ আহমদের হামদ ও নাত ৫৩
মুহাম্মাদ হাবীবুল- াহ হাস্‌সান
'পাঞ্জেরী' কবিতায় ক্রান্তিকালের মুসলিম সমাজ ৬২
শাহ্ সিদ্‌দিক
গণমানুষের কবি ফররুখ আহমদ ৬৯
ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখন্দ
নিবেদিত কবিতা
রেঁনেঁসার কবি ঃ **জালাল খান ইউসুফী** ৭৬

ENGLISH SECTION

In an Ancient Shrine By Farrukh Ahmad ৭৭

Translation: Sayeed Abubakar

ফররুখের হাতেম তা’য়ী

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

“হাতেম তা’য়ী” কবি ফররুখ আহমদের লেখা প্রায় সোয়া তিন-শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এক বিরাট মহাকাব্য। এ আখ্যায়িকা কাব্যটি যখন সাময়িক পত্রিকা মাসিক ‘পূবালী’তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই কবি আবদুল কাদির, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচকগণ একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমি মনে করি, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করলে ভুল তো কিছু করা হবেই না, বরং তাতে এর যথার্থ মূল্যায়ন হবে।

প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আঙ্গিক, গাম্ভীর্য, sublimity স্বর্গ-নরক বর্ণনা, যুদ্ধ-বিদ্রোহের জমকালো বিবরণ এতে নাই বলে কেউ কেউ একে ‘মহাকাব্য’ বলতে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন, কিন্তু মহাকাব্যের প্রাচীন রূপকেই যদি তার একমাত্র সনাতন অনড় রূপ ভেবে এ -ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহলে তা কতটা যুক্তিসহ হবে, তা-ই বিবেচ্য। দুনিয়ার কোনো কিছুই অচল-অনড় নয়-পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু এবং ফর্মও অচল-অনড় অচলায়তনে সীমায়িত হয়ে থাকবে, এটাও প্রগতিশীল চিন্তার লক্ষণ নয়।

তা’ছাড়া প্রাচীনকালে মহাকাব্য লেখা হত পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু একমাত্র পৌরাণিক বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা চলবে না, মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে এমন একটি বিধি-নিষেধের কোনোরূপ যৌক্তিকতা আছে বা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, গ্যেটে-এমন কি আমাদের মাইকেল মুধুসূদন পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁদের মহাকাব্যগুলি লিখেছেন, একথা ঠিক। কিন্তু ঠিক পৌরাণিক কাহিনী নয়, ইতিহাসের পর্যায়েই পড়ে এমন বিষয় বস্তু নিয়েও মহাকাব্য রচিত হয়েছে, তেমন দৃষ্টান্তেরও তো অভাব নাই। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসীর ‘শাহনামা’কে মহাকাব্যই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু ঠিক পৌরাণিক বিষয়ের পর্যায়ে পড়ে না-পড়ে ইতিহাসের পর্যায়ে, এ-কথা সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না। ‘শাহনামা’কে নিশ্চয়ই প্রাচীন ইরানের ধারাবাহিক ইতিহাস বলে অভিহিত করা যায়। ‘শাহনামা’য় যুদ্ধ-বিদ্রোহের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু স্বর্গ-নরকের বিবরণ

তাতে নাই। তবু এই বিশাল ঐতিহাসিক কাব্য বিশ্বসাহিত্যে মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে বলেই জানি। তেমনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ বসুর ‘শিবাজী’ ও ‘পৃথ্বিরাজ’ কায়কোবাদের ‘মহাশ্মান’ ও ‘মহরম শরীফ’ প্রভৃতি রচনাকেও অনেক সাহিত্যরসিক মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তাতে তাঁরা অন্যায় করেছেন বলে আমি মনে করি না। মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচীন Convention তাঁরা ভেঙ্গেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও খুব যুক্তিনির্ভর নয় এই কারণে যে প্রাচীন Convention আঁকড়ে থাকা প্রতিক্রিয়াশীলতারই নজীর মাত্র-এ চলমান বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীলতার কোন স্থান নাই।

ফররুখ আহমদের ‘হাতেম তা’য়ী’কে প্রাচীনকালের পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে মহাকাব্য হয়ত বলা চলে না। এতেই স্বর্গ-নরকের বর্ণনা নাই, আর প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আঙ্গিকের বিশ্বস্ত অনুসরণও তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে যাঁরা এর বিচার করবেন, তাঁদের পক্ষে ‘হাতেম তা’য়ী’কে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, কালে কালে যুগে যুগে অন্য সব-কিছুর মতো সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্যের ধারণাও বদলেছে–বদলে যেতে বাধ্য।

গ্যেটের এপিক-ড্রামা ‘ফাউস্ট’-এর আঙ্গিকে আমরা হোমারের ‘ইলিয়াড’ বা মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’-এর আঙ্গিকের অনুসরণ দেখতে পাই না। একই ছন্দে এটা লিখিত হয় নাই, রসের দিক দিয়েও আগেরকার মহাকাব্যগুলির সাথে ‘ফাউস্ট’-এর পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। তা’ছাড়া লিরিকধর্মী রচনাও এতে আছে। প্রতীকধর্মী চরিত্র–সৃষ্টির দিক দিয়েও ‘ফাউস্ট’-এর একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে। তবু ‘ফাউস্ট’-কে মহাকাব্যের মর্যাদাই দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচকগণ।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ‘হাতেম তা’য়ী’-র সাথে ‘ফাউস্ট’-এর কতগুলি বিষয়ে মিল আছে। একই ছন্দে এটা রচিত নয় ‘ফাউস্ট’-এর মতো এতেও নানা ছন্দের পরীক্ষা–নিরীক্ষার নিদর্শন আছে। তা’ছাড়া প্রতীকধর্মী চরিত্রসৃষ্টি ‘হাতেম তা’য়ী’তে সুপ্রচুর। মানবতা হচ্ছে ‘হাতেম তা’য়ী’র মূল সূর। এ গ্রন্থের নায়ক বা হিরো হাতেম তা’য়ী একটি গগনস্পর্শী মহান চরিত্র। তিনি ঢাল–তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ তেমন করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁর জীবন–রহস্যের সন্ধান দুর্বার অভিযানের চাইতে কম সাহসিকতাপূর্ণ নয়। এই কারণে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির হুবহু অনুসরণ নাই বলে ‘হাতেম তা’য়ী’ মহাকাব্য নয়, এ-ধরনের রায় আমাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীরতারই পরিচায়ক হবে।

বাংলা সাহিত্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এ-এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। প্রাচীন পুঁথির অনুসরণে কাব্য রচনার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। এ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে কিছু

কিছু দেখা গেছে বটে, কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করে একটা আস্ত মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তাছাড়া পুঁথি-সাহিত্যের বিষয়বস্তুই শুধু তিনি গ্রহণ করেন নাই, তাঁর ভাষার বিবর্তিত রূপ আধুনিক যুগে কিরূপ হতে পারে, তারও পরীক্ষা–নিরীক্ষা তিনি এ-কাব্যে করেছেন। নজরুল ইসলামের হাতেই এ-ভাষা সর্বপ্রথম সুষ্ঠু রূপ পায় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে একমাত্র ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছাড়া আর কারুর হাতেই এর সুষ্ঠুরূপ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় নাই। এ-ভাষায় একটা মহাকাব্য লেখার প্রয়াস ফর্‌রুখ আহ্‌মদই প্রথম করেছেন এবং তাঁর চেষ্টা সফলও হয়েছে, এ-কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ দেখি না।

পুঁথিকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'র আধুনিক কাব্যরূপ দানের জন্যে যে এ ভাষাই সুন্দর ও সুসঙ্গত তাতে আমার সন্দেহ নাই, সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষায় এ-কাব্য এত সুন্দর হতে পারত না। আমাদের যেসব উন্নাসিক সাহিত্যকর্মী ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এ-কাব্য রচনায় নাক সিট্‌কাবার দুঃসাহস করবেন, তাদের আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাস 'গন্না বেগম' পড়তে অনুরোধ জানাব। পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো সাহিত্যিক এ-ভাষায় কোনো শিল্পসৃষ্টির কাজে হাত দিলে পূর্ব-পাকিস্তানেরই একশ্রেণীর সাহিত্য-মহলে যেখানে নাক-সিটকাতে দেখা গেছে, পশ্চিম বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেখানে এই ভাষায় উপন্যাস লিখতে দুঃসাহসী হবেন, এটা কে ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু তারাশঙ্কর যেহেতু অত্যন্ত শক্তিশালী বাস্তববাদী কথা-সাহিত্যিক, তাই তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়বস্তু বিচার করে উপযুক্ত ভাষা নির্মাণ করতে না পারলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যি রচনা করা সম্ভব নয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী বাদশাহী আমলের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন তিনি তাঁর এই উপন্যাস 'গন্না বেগম'। সত্যিকার কথা-সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে লিখিত উপন্যাসে সে যুগের সার্থক চিত্র ফুটাতে হলে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। এই কারণে আদ্যোপান্ত এই উপন্যাসটি লিখেছেন, যা আমাদের পুঁথি-সাহিত্যের ভাষার অত্যন্ত নিকটবর্তী এমন কি, পুঁথি-সাহিত্যের এতটা সন্নিহিত ভাষায় কোনো মুসলমান লেখকও এত বড় একটা বই লিখেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। এজন্যে তাঁর উপন্যাসখানা বিন্দুমাত্র অসুন্দর তো হয়ই নাই, বরং মনে হয়, এর চাইতে সার্থক সুন্দর রচনা বাংলা সাহিত্যে খুবই কম লিখিত হয়েছে। তবে সত্যের অনুরোধে আমাকে এখানে বলতেই হচ্ছে যে, লেখকের আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয় নাই-এমন কি ভুলও হয়েছে। তারাশঙ্করের এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানী উন্নাসিক সাহিত্যিকদের, এমন কি পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদেরও, বিষয়বস্তু অনুসারে যোগ্যভাষা নির্মাণে সচেতন করতে পারলে সত্যিই সুখের বিষয় হবে।

মহাকাব্য হিসাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ রচিত 'হাতেম তা'য়ী'র নতুনত্ব সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা যায় যে, এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে রূপ দেখা গেছে, তা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। মাইকেল থেকে শুরু করে এ-যাবত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনায় চৌদ্দ অক্ষরের পদ দেখা গেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার এই কনভেন্‌শন ভেঙেছেন। অবশ্য এর সূচনা তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য থেকেই। তিনি এর প্রতি পদে আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। তাতে এ-ছন্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমার মনে হয় নাই। বরং মনে হয়েছে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে এই নতুন এক্সপেরিমেন্ট তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর সাথে এমন খাপ খেয়েছে যে, চৌদ্দ অক্ষরের পদ যেনো তা এমন সুন্দর হতে পারতো না। এখানে একটুখানি নমুনা দিচ্ছিঃ

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেনে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য এতে অটুট আছে এবং যতি প্রয়োগের নিপুণতার জন্যে রচনার কাব্যময়তা পাঠক-চিত্তে আনন্দের শিহরণ তোলে।

উপমা প্রয়োগের দিক দিয়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ হোমার বা মাইকেলের মতো দক্ষতা বা শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন, একথা বলি না। বিশেষ করে হোমারের উপমায় তাঁর সমসাময়িককালের সমাজ ব্যবস্থার যে পূর্ণায়ত চিত্র পাওয়া যায়, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ উপমা রচনায় সে-দিক দিয়ে যান নাই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপমা চিত্রধর্মী তেমন নয়, যতটা বর্ণনাধর্মী। যেমনঃ

রয়েছে অজানা তবু জীবনের রহস্য বিপুল
–শীতের প্রথম সূর্য কুহেলিতে আচ্ছন্ন যেমন।

কিংবাঃ

–শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে তার
পরিচিত নীড়ে, ফিরিল হাতেম তা'য়ী শাহাবাদে
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষপুটে।

পূর্ণায়ত চিত্র না হলেও এ-উপমাগুলি কম উপভোগ্য নয়, এবং এর কাব্যমূল্যও যথেষ্ট বলেই আমার ধারণা।

আগেই বলেছি, শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এ-মহাকাব্য লেখেন নাই। তিনি নানা সমিল ছন্দও এ-কাব্যে ব্যবহার করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্য"-এ অমিত্রাক্ষর ছাড়া অন্য কোনো ছন্দ ব্যবহার করেন নাই বটে, তবে আমাদের অন্যান্য মহাকাব্য-লেখক কবিদের এ ধরনের রচনায় বিভিন্ন সমিল ছন্দের ব্যবহার দেখা গেছে। একই ছন্দের একঘেঁয়েমী কাটাবার উদ্দেশ্যই সম্ভবত তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও তাঁর পূর্ববর্তী মহাজনদের এ-পন্থা অনুসরণে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। তবে এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, মহাকাব্যে এ-পন্থা অনুসরণের ফলে এর ভাষার একঘেঁয়েমী যত দূরই হয়ে যাক না কেন, মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও Sublimity যেনো এর ফলে কিছুটা ক্ষুণ্ন না হয়ে পারে নাই। সমিল চটুল ছন্দ যত উপভোগ্যই হোক, মহাকাব্যের জন্য অপরিহার্য গাম্ভীর্য ও Sublimity রক্ষার তেমন অনুকূল হতে পারে নাই।

তবে 'হাতেম তা'য়ী'র বিষয়বস্তু এমন বিচিত্র, চমকপ্রদ ও রহস্যময় যে, শুধু এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে এর রসঘন রূপায়ণ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। এবং সম্ভবত এই কারণেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাথে বিভিন্ন ছন্দও এ কাব্যে আমদানী করেছেন। তাতে মহাকাব্য হিসাবে এর গাম্ভীর্য ও Sublimity হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েও থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। **(সংকলিত)**

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর জিলণ্ডর রহমান সিদ্দিকী	প্রাক্তন উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ	প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার
ডক্টর আর.এ. গণি, ডিএসসি	প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিজ্ঞানী
শাহ আব্দুল হান্নান	প্রাক্তন সচিব, ইসলামী চিন্তাবিদ
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউলণ্ডাহ্‌	কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক
ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ	লেখক ও শিক্ষাবিদ

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০০৮ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউলণ্ডাহ্‌
ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০০৯ শাহবুদ্দীন আহমদ
ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০১০ ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০১১ আব্দুল মান্নান সৈয়দ
ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০১২ আব্দুর রাশিদ খান

প্রেমিক ফর্‌রুখ

আবদুল আহাদ

সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল। আমি ও ফতেহ লোহানী প্রায়ই সিকান্দার আবু জাফরের পার্ল রোডের বাসায় আড্ডা জমাতাম। পার্ল রোড ছিল পার্ক সার্কাসে। আমরা সবাই পার্ক সার্কাসেই থাকতাম। একদিন জাফরের বাসায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে জাফর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। ফর্‌রুখ তখন মাঝে মধ্যে জাফরের বাসায় আসত। পাতলা ছিপছিপে ছিল সে তখন। রং ছিল ফর্সা, মুখে দাড়ি ছিল না। এই আমার প্রথম পরিচয় ফর্‌রুখের সাথে। এরপর আরো দু'একবার জাফরের বাসায় দেখা হয়েছে, তবে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল আমার সাথে যখন ফর্‌রুখের প্রথম দেখা, তার বেশ আগেই সে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। মানসিক দিক দিয়ে যেমন, বেশভূষার দিক দিয়েও তেমন একটি পরিবর্তন হয়েছিল। মানসিক দিক দিয়ে যেমন, বেশভূষার দিক দিয়েও তেমন একটি পরিবর্তন তার এসেছিল। একথা অবশ্য পরবর্তীতে ফতেহ লোহানী আমাকে জানিয়েছে। সে আরো বলেছে, ফর্‌রুখ যে সময়ে স্কটিশে পড়ে, তখন সে খুবই রোমান্টিক ছিল। তার শরীরে তখন শোভা পেত লম্বা আদ্ধির পাঞ্জাবী। ধুতি মাটিতে লুটাতো। উল্টিয়ে আচঁড়ানো বড় বড় চুল কিছুটা এলোমেলোই থাকত।

প্রথম সাক্ষাতের কিছু দিন পরেই শুরু হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে কী ভয়াবহ সময়! আর ফর্‌রুখের সাথে দেখা হয় নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়ে গেল। ফতেহ লোহানী চলে এল ঢাকায় খবর পাঠক হিসেবে। আমি কিছুদিন পরে ১৯৪৮-এ ঢাকা এসে বেতারে যোগ দিলাম। আমি চলে আসার অল্পদিনের মধ্যেই সিকান্দার আবু জাফরও চলে এল। ফর্‌রুখ আমাদের কিছু আগেই চলে এসেছিল এবং ঢাকা বেতারে স্ক্রীপ্ট রাইটার হিসেবে যোগ দিয়েছিল। জাফরও তাই ছিল।

সেই সময় ঢাকা বেতারের বড় করুণ অবস্থা। শিল্পী নেই ভাল গান নেই। তখন এই কবিদের অনুরোধ করা হ'ল বেতারের প্রয়োজনে গান লেখার জন্যে।

ঢাকায় আসার প্রথম থেকেই আমি ফর্‌রুখকে নাম ধরে ডাকতাম। ফর্‌রুখও আমাকে নাম ধরে ডাকত। গান লেখার মধ্য দিয়েই ফর্‌রুখের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

তখন ঢাকা বেতারে একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। আমি, ফতেহ্ লোহানী, নাজির আহমদ ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। আমরা একত্রে বসে কত না গল্পই করেছি। তবে আমার সাথে ফর্‌রুখের অন্য সময়েও দীর্ঘক্ষণ গল্প চলত, রাস্তার ওপারে আবনের চায়ের দোকানে বসে।

ঢাকা বেতার তখন নাজিমুদ্দীন রোডে ছিল। ফর্‌রুখকে দিয়ে আমি জোর করে কত ধরনের গানই লিখিয়ে নিয়েছি। ফর্‌রুখ প্রথম দিকে লিখতে চাইত না। তবু আমার পীড়াপীড়িতে অনেক গানই সে লিখেছিল। আমি যতটুকু অনুভব করেছি, ফর্‌রুখ যেন তার প্রেমিক মনকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ফর্‌রুখের মনটা ছিল প্রেমিকের। এই ফর্‌রুখের হাত থেকে একদিন 'ডাহুক' কবিতা বেরিয়েছে।

ফর্‌রুখের কাছে তখন ধর্ম এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান এইটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবু পীড়াপীড়ি করে ফররুখকে দিয়ে আমি অনেক প্রেমের গান লিখিয়ে নিয়েছি। সে গানগুলি কাব্যের দিক থেকে খুবই উন্নতমানের ছিল। ফর্‌রুখ আগে কখনো গান লেখে নি। কিন্তু গান লিখতে যখন আরম্ভ করল, দেখলাম, গান লেখার ব্যাপারে ফর্‌রুখের দক্ষতা রয়েছে। কেননা, মূলত সে তো কবি। ফর্‌রুখের কয়েকটি প্রেমের গানের অংশ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ

যে বসন্ত ফিরে যায়
জীবনে সে ফিরবে না হায়
শেষ হবে তার সাথে
এ দিনের সব গান।
এদিনের সব সুর
হয়ে যাবে অবসান।
এ দিনের সব আলো
মুছে যাবে নিশি-ছায়।

আর একটি গান–

ঝরে যায় শবনম ভোরের হাওয়ায়
বেদনার সব রাতি বুঝি না ফুরায়!
.....
অভিশাপসম জাগিব তোমার প্রাণে
তোমার ব্যথায়, তোমার ছন্দ গানে।
.....
আকাশের আলো আকাশে মিলালো
ধরণীর ছায়া ম্লান

হের পিঙ্গল মোর নভতল
শোনে মরণের গান ॥
.....
জ্বলি শামাদানে,
জ্বলি বেদনার দাহে
শত জ্বালা সয়ে
এ হৃদয় থাকে
পড়িয়া তোমার রাহে।
.....
হায়রে বসন্ত যায়
বনেরও ফুলদল কাঁদিয়া লুটায়।
জীবনের সুর অম্লান
বুঝি সে হল অবসান।
চঞ্চল ফাল্গুন-দিন সুদুরে হারায়।

হৃদয়ের মণিদীপ জ্বালি
এতদিন সাজায়েছি ডালি
ফল্গুন শেষে আজি হায় কোথা সে মিলায় ॥
শুক্তি বক্ষে রেখেছে মুক্তা।
সিন্ধুর প্রাণকণা
এতটুকু মিলিল না।
ঊর্মি-উতল জীবনে তোমার
খোলে না দুয়ার মেলে না তো পাখা
নিশীথ আঁধারে হারায়ে দু'ধারে
বিরল সম্ভাবনা।
.....
আমার শেষ হল না আশা
আমার মিটল না পিপাসা
.....
উঠলো যদি আঁখির পলক
একটি নিমেষ অনন্তকাল।

এমনিভাবে আরো অনেক প্রেমের গান ফর্‌রুখকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। ফর্‌রুখের অন্য ধরনের গানও আছে। যেমন–

দূর দিগন্তের ডাক এল, চল বীর চল নির্ভয়,
বুনিয়াদ হল নব সৃষ্টির শুরু,

ইত্যাদি গানগুলো ফর্‌রুখ আমার জন্য লিখেছিল। ফর্‌রুখকে তখন বেশ গানের নেশায় পেয়েছিল এবং সে নেশা আমি ধরিয়ে দিয়েছিলাম। এ ছাড়া ফর্‌রুখ কবি ইকবালের বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করে। এই অনুবাদ অনেক জায়গায় ইকবালের মূল কবিতাকে হার মানিয়েছে বলে আমার ধারণা। এ অনুবাদের একটিতে আমি সুরারোপ করেছিলাম। কবি ইকবালের লেখা ছিলঃ

ফির চেরাগে লা'লা সে
রওশন হুয়ে কোহো দমন

যার তর্জমা ফররুখ করেছিল এইভাবেঃ

রঙিন লালার দীপশিখাতে
হল উজল শিলা কানন।

ফর্‌রুখের চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ছিল, সেটা হ'ল সত্যকে সে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করত। ফর্‌রুখ প্রায়ই আমাকে নানা কথার মাঝে বলত, "কবিতায় আমরা পশ্চিম বাংলার চেয়ে পিছিয়ে নেই, কিন্তু গদ্যে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। আমাদের গদ্যে ঐ সাবলীল ভঙ্গী আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে।"

সাহিত্যের আলোচনা যখন করতাম, ফর্‌রুখ বঙ্কিমের প্রশংসা করত, বলত, "আমাদের জন্য হয়ত বঙ্কিম ভাল নন, কিন্তু বঙ্কিমের একটি গান কিভাবে সমস্ত হিন্দু জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনকে প্রেরণা যুগিয়েছিল, তার নজীর নেই।" 'বন্দে মাতরম' নামক সে গানটি অনেকেই জানেন।

একটা কথা ফর্‌রুখ আমাকে বলত, "আমাকে অনেকেই গোঁড়া মনে করে, কিন্তু জানো, আমার বিছানার একপাশে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' থাকে এবং অন্যপাশে থাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'।"

ফর্‌রুখ যে জিনিসটাকে বিশ্বাস করেছিল, সে বিশ্বাসে সে অটল ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর মত এই ধরনের বিশ্বাসী মানুষ আমাদের সমাজে বিরল।

প্রফেসর ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ রচিত

ফররুখের নির্বাচিত কবিতার নিগূঢ় পাঠ

প্রকাশক ঃ আখতার প্রকাশনী। মূল্য ১১০ টাকা, ইউ এস ঃ ৫ ডলার।
আপনার কপি সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুনঃ ০১৯১২৪২২৭৫৮

অভিভাষণ

প্রফেসর জিলুর রহমান সিদ্দিকী

[বিগত ১০ জুন, ২০১২ তারিখে মানবতার কবি ফররুখ আহমদের ৯৪তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির রের্কডকৃত ভাষণ। অনুলিখনঃ সম্পাদক, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা]

আমি অনুষ্ঠানে আসার পূর্বে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছুই জানতাম না। এখানে এসে জানতে পারলাম তারা বেশ কিছুদিন যাবৎ এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করছেন, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা এবং ফররুখ আহমদের উপর গ্রন্থাদি প্রকাশ করছেন। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও একজন ফররুখ-গবেষককে পুরস্কৃত করছেন। এবারে তারা কবি আব্দুর রশিদ খানকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করলেন। আব্দুর রশিদ ফররুখের কিছু নির্বাচিত কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে অসাধারণ একটি কাজ করেছেন। এজন্য তিনি অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন তাঁকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করে একটি প্রসংশনীয় কাজ করেছে।

কবিতা অনুবাদ করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। আমি নিজেও একসময় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি, তাই বুঝি এ কাজটি কত কঠিন। সে কাজটা যে আব্দুর রশিদ খান করেছেন সেজন্য আমি তাকে সাধুবাদ জানাই এবং আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি এ কাজটি তিনি ভালভাবেই সম্পন্ন করেছেন, কবির প্রতি সুবিচার করেছেন। অনুবাদে অনেক সময় কবিতার অসল জিনিসটাই হারিয়ে যায়। প্রত্যেক কবিতায় একটি ম্যাসেজ থাকে, একটি বার্তা থাকে। সে বার্তাটা যদি যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে অনুবাদ সার্থক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কবিতার অনুবাদ করা যে কতটা দুরূহ যারা এ কাজটি করেছেন তারাই সে সম্পর্কে অবগত এবং অনুবাদ থেকে যদি এটা ধারণা করা যায় যে মূল কবিতার আসল বাণী বা বার্তাটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাহলে সেটাকেই সার্থক অনুবাদ বলা যায়। অনুবাদে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা আমাদের নেই। এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এর ব্যতিক্রম আছে যেখানে অনুবাদ এতটাই নিজের সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথকভাবে যে, সে অনুবাদকে আমরা

আর অনুবাদ বলে মনে করি না। সেটা মূল কবিতার মর্যাদা পেয়ে যায়। যেমন- রুবাইয়েতে ওমর খৈয়ামের অনুবাদ ইংরাজ কবি ফিটজেরাল্ড (Fitzerald) সেটাকে ফিটজেরাল্ডের কবিতা হিসাবেই আমরা দেখি। ওমর খৈয়াম আছেন সেখানে কিন্তু যিনি ধরা দিচ্ছেন কবি হিসাবে তিনি ফিটজেরাল্ড। এ ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনা কখনও কখনও ঘটে।

যাইহোক, ফররুখ আহমদকে আজ আমরা কতটা স্বীকার করি, কতটা মান্য করি সে প্রশ্নটা আছে এবং এটা ঠিক যে, তাঁকে একটি বিশেষ ভাবাদর্শের কবি হিসাবে বাংলাদেশের কবিতার মূলধারা থেকে কিছুটা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রত্যেক কবিরই একটি নিজস্ব ভাবাদর্শ থাকে। আমরা তাঁকে কখনও তাঁর ভাবাদর্শ দিয়ে বিচার করি না। বিচার করি তাঁর কবিতা শিল্প-সৌষ্ঠবে মানোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা। এ বিচারে মানোত্তীর্ণ না হলে তাঁকে কবি বলা যায় না। ফররুখ আহমদকে এ মানদন্ডে কেউ অনুত্তীর্ণ বলার দুঃসাহস করবে না। শিল্প-বিচারে তাঁর কবিতা অসাধারণ। তাই বাংলা কবিতার মূলধারা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। বরং এক সময় আমাদের দেশের অনেক বড় কবিরাও তাঁর কবিতার মোহজালে আচ্ছন্ন ছিলেন এবং অনেকেই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

আমি যখন কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি তখন কবির বয়স মাত্র ২২-২৩ বছর, আমার বয়স মাত্র ১২/১৩ বছর। কি আশ্চার্য লাগে যে, ঐ সময়ই কবির সঙ্গে আমার কবিতা নিয়ে কথা-বার্তা হয়েছে। তিনি আমাকে অপগণ্ড বালক হিসাবে খারিজ করে দেন। তারপর আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেই ১৯৪৫ সালের দিকে, তখন তিনি কলকাতায় মওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা মাসিক মোহাম্মদীর নৈপথ্য সম্পাদক হিসাবে কর্মরত। সম্পাদক হিসাবে মওলানার নাম ছাপা হতো। কিন্তু পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন মূলত ফররুখ আহমদ। ঐ সময় তিনি আমার প্রথম কবিতা গ্রহণ করেন এবং ছাপেন। এরপর তিনি সবসময় চাইতেন যেন আমি লিখি। এই যে উৎসাহটা পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে সেটা জীবনে কখনও ভুলবনা। এরপর আমার লেখার পেছনে তাঁর অনুপ্রেরণা সবসময় কাজ করেছে।

ফররুখ আহমদ আমাদের চোখের সামনেই হঠাৎ বদলে গিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি একজন বামপন্থী এবং ভীষণ রকম ঝুঁকিপূর্ণ বামপন্থী কাজের সাথে তিনি নিজেকে জড়িয়েছিলেন। তারপরে তাঁর মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন আসে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগের জগতে এবং ঐসময়ই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত (১৯৪৪) হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই মেনে নিল এটা

একটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। 'সাত সাগরের মাঝি'র বেশ কিছু কবিতা অসাধারণ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবি-খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তাঁর 'আজাদ কর পাকিস্তান' নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত (১৯৪৬) হয়। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'সিরাজম মুনীরা' (১৯৫২) কাব্য। কবির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থে। এরপর 'মুহূর্তের কবিতা' নামে তাঁর বিখ্যাত সনেট কাব্য প্রকাশিত হয়। 'মুহূর্তের কবিতা' ঐসময় প্রকাশিত হলেও কেন জানিনা কোন অজ্ঞাত কারণে সেটা তখন বাজারে প্রচার হয়নি। কবির মৃত্যুর পর আমি 'মুহূর্তের কবিতা' গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করি এবং সেই সাথে তার প্রথম যৌবনের কবিতার সংকলন 'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামে সম্পাদনা করে প্রকাশ করি। এভাবে আমি কবির রচিত দু'টি কাব্য গ্রন্থ একসময় সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছি।

ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে, তাঁর ভাবাদর্শ যাই থাকনা কেন, তিনি কখনও কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ গ্রহণ করেননি। এমনকি রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহও তিনি গ্রহণ করেননি। এমনকি পাকিস্তান আমলে সরকার তাঁকে যে সকল সম্মাননা প্রদান করেছেন, তিনি নিজে তা কখনও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাড়িতে এসে কেন্দ্রিয় সরকারের একজন সচিব সে সম্মাননা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি কখনও আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সফর-সঙ্গী হননি। তিনি বারবার আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও দেশের বাইরে এমনকি পাশ্চিম পাকিস্তান সফরেও যাননি। কারো কোনরূপ অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেননি। এই যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এটা সমাজে অতিশয় বিরল। তিনি তাঁর কবি-সত্তায় আস্থাশীল ছিলেন এবং সেকারণেই তিনি সকলের প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং তা নিয়েই বেঁচে থেকেছেন এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এই যে মানুষটি প্রবলভাবে আত্ম-বিশ্বাসী এবং নিজের কাব্য-সত্তায় আস্থাশীল, সে মানুষটি শুধু অসাধারণ নয় বর্তমান সমাজে তার নজির একান্ত বিরল। যদিও জাগতিক নানা বঞ্চনা, দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুঃসহ কষ্টের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তবু তিনি কখনো কারো অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন না। একারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কারো কাছে মাথা নত করে নয়, মাথা উচু করেই সকলের শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত গৌরব। তাঁর ব্যক্তিত্বের মত তাঁর কাব্য-নৈপুণ্যও চিরকাল সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানুষ হিসাবে তিনি যে অসাধারণ ছিলেন তা আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি।

তাঁর কর্মস্থল রেডিও পাকিস্তানে তাঁকে ঘিরে সকলেই সেখানে জড় হতেন। তিনি তাদেরকে চা-নাস্তা খাওয়াতেন। তাঁকে ঘিরে আড্ডা জমে উঠতো। সব মতাদর্শের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সেখানে আসতেন এবং তিনি সকলের মধ্যমণি হিসাবে তাদের কাছে এক প্রাণবন্ত মানুষ হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। তিনি যা আয় করতেন, তার একটা বড় অংশ রেডিও পাকিস্তানের সামনের আবন মিয়ার চায়ের দোকানে বসে সকলকে আপ্যায়ন করে ব্যয় করতেন। এরকম সৌজন্যবোধ ও মেহমাননেওয়াজ ব্যক্তি আমাদের সমাজে অতি বিরল। এটা ছিল ফররুখের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আজকে কবি হিসাবে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে হলে আমি বলবো যে, আমার ধারণা তিনি সন্দেহাতিতভাবে বাংলা সাহিত্যের একজন মৌলিক কবি। আমার মনে আছে, কলকাতায় তাঁর কবিবন্ধু সুভাস মুখোপাধ্যায় একবার ঢাকায় এসে তাঁর খোঁজ করেছিলেন, পেয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না কিন্তু সুভাস মুখোপাধ্যায়ের মতো কবি ফররুখের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তারা দুজনই একসময় কলকাতায় বসবাস করতেন এবং পরস্পর বন্ধু ছিলেন। দীর্ঘদিন পর ঢাকায় এসে তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু ফররুখকে খুঁজেছিলেন। তিনি বলতেন ফররুখের ভাবাদর্শ যাই হোক না কেন, কবি হিসাবে তিনি অসাধারণ।

আমি মনে করি, ফররুখ আহমদের জন্ম শতবার্ষিকী এগিয়ে আসছে। আর কয়টি বছর বাকী আছে। এ সময় যতদূর পারা যায় তাঁকে, তাঁর কবিতার প্রচার যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সে চেষ্টা আমাদের সকলের থাকা উচিত এবং বিশেষ করে যারা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ শুনছে না, জানছে না, কিছু দেখছে না যে মূলধারায় যেখানে আমাদের বাংলা কবিতা এগিয়ে চলেছে সেখানে মূলধারার কবিতা নিয়ে যেখানে আলোচনা চলছে সেখানে ফররুখ আহমদ অনুপস্থিত। এটা কেন হয়েছে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু এই পরিস্থিতিটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি কোন বিশেষ গোষ্ঠির কবি নন। তিনি সকলের কবি, প্রকৃত কবিরা মূলত সকলের কবি, সব সময়ের কবি। আমি মনে করি ফররুখ আহমদ সকলের কবি এবং তিনি বাংলা সাহিত্যে একজন অমর কবি।

কিন্তু বর্তমানে ফররুখ কেন সকলের কবি হতে পারছেন না, সে প্রশ্নটাই এ অনুষ্ঠানে আসার পর থেকে আমাকে পীড়িত করছে। এখানে তো সকলে নেই। আমি যাদেরকে আশা করি তারা এখানে অনুপস্থিত। যারা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেন, আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা-সমালোচনা করেন, তারা কেউই এখানে নেই। এটা কি কারণে হয়েছে সেটাই আমি

ভাবছিলাম যে এইভাবে তো তাঁকে খণ্ডিত করলে চলবে না। তাঁকে সকলের মধ্যেই যেতে হবে, সকলের কাছেই তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। সকলের কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে আমি মনে করি। সেই গ্রহণযোগ্যতার পরিচয়ই আমি দেখছিনা। এমনকি সেক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীও কিছুটা অপরাধী বলে আমি মনে করি। বাংলা একাডেমী অন্যদের ক্ষেত্রে যেটা করে থাকে ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে সেটা তারা করেনি। অনেক আলোচনা হয়ে থাকে অনেককে নিয়ে, অনেকের জন্ম দিন মৃত্যুদিন পালিত হয় কিন্তু ফররুখকে নিয়ে বাংলা একাডেমী এধরনের কোনো অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করে না। এ পরিস্থিতি থেকে ফররুখ আহমদকে বের করে আনার দায়িত্ব আমাদের সকলকে পালন করতে হবে।

ফররুখ আহমদের কবিতার প্রচার যাতে অব্যাহত থাকে সেটা দেখতে হবে, তাঁর বই যাতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, যারা তাঁর বই পেতে চায় তারা তা পাচ্ছেনা। কারণ তাঁর নিজের কবিতার শক্তিতেই তিনি দাঁড়াবেন এবং চিরকাল বেঁচে থাকবেন। যে কবি 'সাত সাগরের মাঝির' অনবদ্য কবিতাগুলো রচনা করেছেন, তাঁর জন্য আর কারো কিছু করার প্রয়োজন নেই। তাঁর কবিতাকে সকলের সামনে উপস্থিত করতে হবে। কবিতার প্রাপ্ততাকে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে যারা কবিতা বোঝে, কবিতার আবেদন যাদের কাছে আছে, তারা ঠিকই ফররুখ আহমদকে চিনে নিবে এটা আমার বিশ্বাস।

আজকে অনেক কবিতা শোনা হলো। এগুলো শুনে মনে হয়েছে, তাঁকে নিয়ে অনেকের আগ্রহ আছে। অনেকেই তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, কিন্তু ফররুখ আহমদ এখানে উপস্থিত থাকলে তিনি এ কবিতাগুলোকে কীভাবে গ্রহণ করতেন আমি জানিনা। তবে আমি মনে করি কবিতা লেখার জন্য যে ন্যূনতম পরিশীলনের প্রয়োজন আছে যা না থাকলে কবিতা হয় না, সেটার অভাব অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। কবিতা লিখে গেলেই তা হয় না। কবিতা রচনার জন্য প্রচুর চর্চা প্রয়োজন। ভাল কবিতার সাথে পরিচয় থাকতে হবে। সুকবিতার সাথে পরিচয় থাকতে হবে। অনেক ভাল কবিতা মুখস্থ থাকতে হবে। তাহলে একজন হয়তো বিশেষ মুহূর্তে একটি ভাল কবিতা রচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ভালো কবিতার যে সমাদর আছে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। পহেলা বৈশাখে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ অথবা তাঁর কাছাকাছি বিভিন্ন স্থানে যে সব কবিতার আসর বসে সেখানে দেখা যায় যে, সারা বাংলাদেশ থেকে কবিরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এসে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে কবি

হিসাবে যারা সম্মানিত- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, ফররুখ আহমদ এবং ফররুখ আহমদের সমসাময়িক কবি আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন এঁরা ছিলেন তিরিশোত্তর যুগের প্রথম আধুনিক বাংলা কবি। এঁদের কবিতা প্রায়ই একসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হতো। বিশেষ করে মোহাম্মদী পত্রিকায়, আমি দেখেছি এদের জন্য একটি বিশেষ জায়গা ছিল। আবুল হোসেন, ঐ সময়কার একমাত্র কবি যিনি এখনও বেঁচে আছেন, যার বয়স ৯০ এর কাছাকাছি, তিনি সারা জীবনই কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। আলী আহসানও কবি হিসাবে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। আহসান হাবীবও তাই। এই যে চার জন কবি প্রায় একই সময় লিখতে শুরু করেছিলেন, এঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই কবি পরিচয় নিয়ে সগৌরবে টিকে আছেন।

আমরা এখন বাংলাদেশে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে আছি, সমাজটা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদও ব্যতিক্রম নন। বর্তমানে তিনি যে অবস্থানে আছেন সেখানে পরিবর্তন আনতে হবে। আমি মনে করি, তিনি কোন গোষ্ঠীর কবি নন। তাঁর কবিতায় সর্বজনীন ও সর্বমানবিক একটি আবেদন আছে। তাই তিনি কেন শুধু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কবি হয়ে থাকবেন? কেন তিনি সকলের কবি হতে পারবেন না? আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ফররুখের কবিতার দ্বারাই এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব এবং তাঁকে সর্বসমক্ষে সর্বজনীন কবি হিসাবে তুলে ধরা সম্ভব। তাঁর কবিতার মধ্যে সেধরনের সর্বজনীন ও সর্বমানবিক এক শক্তিশালী আবেদন আছে।

আমি ফররুখ আহমদের স্নেহধন্য। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি এবং সত্যিকথা বলতে কি, ঐ সময়ে আমার কবিতার রুচি গঠনে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের প্রতি তাঁর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, সেটা তাঁর কবিতার উপরে বিভিন্নভাবে ছাপ ফেলেছে। যারা তাঁর হাতেম তা'য়ী পড়েছেন অথবা আজকে এখানে আমরা তাঁর যে সব কবিতার আবৃত্তি শুনলাম, তা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর কবিতার ভাষায় যে দাঢ্য, যে শক্তি এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, এটা যে তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, এখানে কিন্তু মাইকেলের অবদান আছে।

ফররুখ আহমদ কবিতা আবৃত্তি করতেন খুব আবেগ দিয়ে। নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন রেডিও পাকিস্তানে। তখনকার দিনে রেডিও পাকিস্তানে তিনি বহুবার তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আমি তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনেছি। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে চিনতেন, তাদের মনে আছে তাঁর একটি অপূর্ব কণ্ঠস্বর

ছিল। সেই কণ্ঠে তিনি যখন তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন, তখন তাঁর কবিতা একটি ভিন্নরূপে ধরা দিত। কবিতা জীবন্ত হয়ে উঠতো।

আজকে আমার নিজের একটি অপরাধবোধ আছে তাঁর সমন্ধে যে তাঁকে নিয়ে আমি অল্প কিছু কাজ করেছিলাম, তাঁর দু'টি কাব্য সম্পাদনা করেছিলাম। কিন্তু আরো অনেক কিছু হয়তো আমার পক্ষে করা উচিত ছিল। সেটা করা হয়নি। সুতরাং একটা অপরাধবোধ আমার রয়ে গেছে। কিন্তু আমার কিছুটা ভাল লাগছে একারণে যে আপনরা এ অনুষ্ঠানে আমাকে ডেকেছেন। কারণ অনেক অনুষ্ঠান হয় আমি কাগজে পড়ি, কিন্তু আমাকে কেউ কখনও আমন্ত্রণ জানায়নি। অথচ যারা জানেন, তারা জানেন যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আমি তার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমি তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম এবং তাঁর উপরে সামান্য কিছু কাজও আমি করেছি।

যাইহোক, আমি আজকে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহম্মদ মতিউর রহমানকে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তার এই সুন্দর অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে ডেকেছেন– যে কারণে আমি এখানে আসবার সুযোগ পেলাম এবং এখানে এসে বুঝতে পারলাম যে, ফররুখ আহমদ হারিয়ে যাবার মত ব্যক্তি নন। তিনি কখনও হারাবেন না, হারিয়ে যাবেন না। তিনি তাঁর কবি পরিচয়েই বেঁচে থাকবেন এবং চিরকাল উজ্জ্বলভাবে বেঁচে থাকবেন। এ অনুভূতিটা নিয়ে যে যেতে পারছি, সে জন্য আমি এ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই, মতিউর রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

ফররুখ গবেষণা ফাইন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও
'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র সম্পাদক
মুহম্মদ মতিউর রহমান রচিত
(প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা)

ফররুখ প্রতিভা
পৃষ্ঠা - ৪৩২, মূল্য - ৪০০ টাকা মাত্র
হেরা পাবলিকেশন্সঃ ৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন: ০১১৯১৭৮৭৩০০

ফররুখ কাব্যপাঠঃ কিছু সমস্যা

ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদ। তাঁকে নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। অনেক বই এবং অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবু মনে হয়, তাঁর কাব্য নিয়ে পাঠকের বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের কিছু সমস্যা আছে। এ প্রবন্ধে আমি সেগুলোর উপর আলোকপাত করবো।

ফররুখের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র (১৯৪৪) জাগরণমূলক কবিতাসমূহ, যেগুলোর জন্য তিনি সমধিক পরিচিত, আরবি, ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'সিন্দবাদ' কবিতার প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করা যাকঃ

কেটেছে রঙীন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

উপরোক্ত স্তবকে অনেকগুলো শব্দ যেমন মখমল,সফর, দরিয়া, জোরওয়ার, মউজ, শির, সফেদ, চাঁদির তাজ, পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ আরবি-ফারসি থেকে নেয়া হয়েছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, কবিতার বক্তা যেহেতু আরব্য উপন্যাসের নায়ক তাই তার মুখে স্বাভাবিকভাবে তার ভাষা ও ঐতিহ্য থেকে শব্দচয়ন করা হয়েছে। এতে তার চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, কবি ভাষায় নতুনত্ব এনেছেন। শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে তা একঘেয়ে হয়ে যায়। তাই নতুন শব্দ বা পুরোনো শব্দের নতুন প্রয়োগ কবির শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। তৃতীয়ত, উপরোক্ত শব্দে ও চিত্রকল্পে ধ্বনি-মাধুর্য্য সৃষ্টি হয়েছে। 'পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ' আর 'পাহাড় সমান ঢেউ' ধ্বনির দিক দিয়ে এক নয়। 'পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ' শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা ও শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছে, 'পাহাড় সমান ঢেউ' ব্যবহারে তা কখনো সম্ভব হতনা।

কিন্তু ঐ শব্দগুলো অধিকাংশ পাঠকের অজানা। ওগুলোর অর্থ বুঝতে হলে তাদেরকে অভিধান দেখতে হবে। কবিতা পড়তে গিয়ে বার বার অভিধান দেখা বিরক্তিকর। ফলে কবিতা পাঠের আগ্রহ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে মনে

করতে পারেন যে শব্দগুলো শিক্ষিত পাঠকের জানার কথা। কিন্তু আসলে তা নাও হতে পারে। আর বর্তমানে আরবি-ফারসি শব্দ এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এমনকি গণমাধ্যমসমূহ আমাদের ভাষায় একসময় প্রচলিত আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দরাজি বর্তমানে পরিহার করার প্রবণতা দেখা যায়। আগে আমরা 'লাশ' শব্দ ব্যবহার করতাম, এখন তা হয়েছে 'মরদেহ'। আগে 'মরহুম' বলতাম, এখন 'প্রয়াত' বলা হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে শিক্ষিত লোকদের কাছেও ফররুখের কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় ফররুখের কবিতার ফুটনোট সংবলিত সংস্করণ বের করা জরুরী। ইংরাজি সাহিত্যে অনেক কাব্য-সংকলনে অপ্রচলিত শব্দের ফুটনোট দেয়া থাকে। অনেক কবিতায় allusions থাকে, যেগুলোর ব্যাখ্যা না জানলে বক্তব্য বোঝা যায় না। তাই সে সব allusions এর ব্যাখ্যা দেয়া থাকে। ফররুখের অনেক কবিতায় allusions আছে, যেমন– হযরত খিজিরের (আ) কথা, গুলেবাকাওলীর কথা আছে, হেরার রাজতোরণের কথা আছে।

আরো একটি কথা। সাধারণ পাঠক অনেক সময় কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে পারেন না; কিন্তু সমালোচকরা হয়তো তা পারেন। নিগূঢ় অর্থ, কাব্য-কৌশল তারা আবিষ্কার করতে পারেন কারণ তারা বার বার মনোযোগের সঙ্গে কবিতা পড়েন এবং তাদের রসবোধ সাধারণ পাঠকের চেয়ে অনেক বেশী। তাই ফররুখের কাব্য সংকলনের সঙ্গে ফুটনোটসহ প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বা বিশ্লেষণ যদি সংযুক্ত করা হয়, তাহলে ফররুখ কাব্যের জনপ্রিয়তা অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। উল্লেখ্য,ইংরাজি সাহিত্যে অনেক কবির এ ধরনের সংকলন আছে।

ফররুখের কাব্য পাঠে আর একটি অসুবিধা আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। সেটি হলো তিনি নাকি সাম্প্রদায়িক এ অর্থে যে, তিনি শুধু মুসলিম জাতির কথা লিখেছেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন পাকিস্তানপন্থী। এসব অভিযোগের জবাব দেয়া দরকার। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় তিনি মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা যুগিয়েছেন। কিন্তু নজরুল ইসলামও–যাঁকে অসাম্প্রদায়িক বলা হয়–মুসলিম পুনর্জাগরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি কিন্তু হিন্দু পুনর্জাগরণের কথা বলেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে সামপ্রদায়িকতার অভিযোগ ওঠে না। তাহলে ফররুখের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেন? তারা যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ভারতে রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। হিন্দু ও মুসলমান দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য

আন্দোলন করেছিল। নজরুল অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন; ফররুখ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে কেউ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন না। George Oxwall লিখেছেন, 'in the modern world no one describable as an intellectual can keep out of politics in the sense of not caring about them' (Notes on Nationalism). তাই ফররুখের কাব্য পড়তে গিয়ে আমাদের তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে। আমাদের Historical sense বা ঐতিহাসিক চেতনা থাকতে হবে।

খুব কম লোকেই তাদের সময়ের উর্দ্ধে উঠতে পারেন। আবার রাজনৈতিক মতবাদ সময়ের পরিবর্তনে বদলায়। ইংরাজ কবি Wordsworth ফরাসী বিপ্লবের একজন অতি উৎসাহী সমর্থক ছিলেন; কিন্তু এ বিপব যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়, তখন তিনি এ আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তিনি ইংরাজ সরকারের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন তাঁর কাব্যের মূল্যায়নে কোন প্রভাব ফেলে নি। জন মিল্টন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। প্রজাতন্ত্র উৎখাত করে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি নির্যাতীত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর কাব্যের মূল্যায়নে কখনো প্রভাব ফেলেনি। তাই ফররুখের মূল্যায়নে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

তাছাড়া, যেসব কবি ইসলামী পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ফররুখের পার্থক্য আছে। তাঁরা সরাসরি মুসলিম জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন, যেমন নজরুল ইসলাম লিখেছেন–

নাই তাজ, নাই লাজ
ওরে মুসলিম, খর্জ্জুর শীষে তোরা সাজ।

কিন্তু ফররুখ সরাসরি মুসলমানদের জাগরণের আহ্বান জানান নি। তিনি allegory ব্যবহার করেছেন। Allegory কাকে বলে? এ জাতীয় লেখায় একটা surface story বা প্রকাশ্য ঘটনা থাকলেও তার একটা Underlying meaning বা অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য থাকে। সপ্তদশ শতাব্দির ইংরাজ কবি Dryden এর Absalom and Achilophil এ জাতীয় একটি কবিতা। এ কবিতায় Dryden তৎকালীন একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে বাইবেলের Old Testament এর রাজা David এবং তার পুত্র Absalom এর ঘটনাকে Allegory হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এ Allegory সম্বন্ধে T.S Eliot লিখেছেনঃ "He made the small into the great, the prosaic into the poetic and the trivial into the magnificent." (Homage to Dryden).

ফররুখ 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত জাগরণমূলক কবিতা লিখতেও এ Allegory ব্যবহার করছেন। তিনি সরাসরি মুসলমানদের প্রতি জাগরণের আহ্বান জানান নি। তিনি আরব্য-উপন্যাসের সিন্দবাদের কাহিনীর মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি একটি সার্থক Allegory আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তিনি একজন নাবিকের জাগরণের কথা বলেছেন যে নাবিক দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে ছিল। তাকে জেগে ওঠার জন্য তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য লেখকের 'ফররুখের নির্বাচিত কবিতার নিগূঢ় পাঠ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

তাছাড়া, তিনি শুধু জাগরণমূলক কবিতা লেখেন নি, তিনি ক্ষুধিত মানুষের কথা বলেছেন, মেহনতী জনতার কথা বলেছেন। তাঁর 'লাশ' ও 'আওলাদ' কবিতা এ শ্রেণীভুক্ত। প্রথমটিতে তিনি রাজপথে এক ব্যক্তির অনাহারজনিত মৃত্যুর সকরুণ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সমাজের বিত্তবানদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে অনাহার-ক্লিষ্ট পুরুষ নারী ও শিশুর মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন এবং আল্লাহর দরবারে বিচারের জন্য ফরিয়াদ করেছেন এবং গণমানুষের প্রতি গভীর দরদ ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। 'অনুস্বার' কাব্য গ্রন্থে সমাজে বিরাজমান লোভ-লালসা, ভণ্ডামী, গ্লানি ইত্যাদি নৈতিক অবক্ষয় উদ্ঘাটন করেছেন এবং এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন। তাঁর মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে 'হাতেম তা'য়ী' নামক মহাকাব্যে। 'সিরাজুম মুনীরা' কাব্যে মহানবী (স) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে। তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, শিশুদের জন্যও কবিতা লিখেছেন।

বস্তুতঃ তাঁর কাব্য একটি বিষয়বস্তুতে সীমিত থাকেনি। তিনি আমাদের জীবনের প্রায় সবগুলো দিক স্পর্শ করেছেন। তাঁর কাব্য তাই জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য পাঠ আমাদের আলোকিত করে, পুলকিত করে, জীবনদৃষ্টি সম্প্রসারিত করে। সর্বোপরি, তাঁর কাব্যের শিল্পরূপ ও সৌন্দর্য আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তাই বলা যায়, তিনি একজন পরিপূর্ণ কবি। তাঁকে কোন সংকীর্ণ বিবেচনায় বা গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না।

কবি ফররুখ আহমদ, এক ব্যতিক্রমী কবি

জুবাইদা গুলশান আরা

পৃথিবীর সব দেশই সাহিত্য এক নিরলস বুদ্ধির, বোধির ও পর্যবেক্ষণের ধারা অনুসরণ করে চলে। পাশ্চত্য সাহিত্যে সেক্সপীয়র, বায়রন, মিলটনের পূর্ব ধারা যেমন ক্লাসিক ধারার সাহিত্য-চিন্তা ও চেতনাকে প্রতিফলিত করে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছে, পরবর্তীতে নতুন স্রোত, জীবন দর্শন ও ভাব-ভাষা এসে জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের দেশে প্রাচীন ধারা এক সময় কৃত্তিবাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ থেকে ক্রমশঃ সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। চর্যাপদের প্রাচীনতা থেকে আলাওল, হেয়াত মাহমুদ থেকে সে ধারা প্রাচীন পুঁথি সাহিত্য, সুফী সাহিত্যকে অনুসরণ করে পদুমাবত, মনোহর মধুমালতীর রোমান্টিক স্রোতকে পৌঁছে দিয়েছে ঐতিহ্য ইতিহাস ভিত্তিক কাব্য চর্চায়। গদ্যে নতুন পথ সৃষ্টি হয়েছে। 'ছহি বড় জঙ্গনামা'র পর্যায় থেকে বাংলা সাহিত্য চলমানতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মোজাম্মেল হক, নবীনচন্দ্র সেন, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যে নানা ভাব, ভাষা ও বিষয় নিয়ে সৃষ্টি করেছেন মহৎ সাহিত্য। পরিবর্তন আসে সময়ের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনে। তেমনই ফররুখ আহমদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সাহিত্যের নতুন আবহে এসেছিলেন এক উজ্জ্বলতার প্রতীক হয়ে। তিনি ছিলেন নানা বৈচিত্র্যের অধিকারী। বর্তমান শতকে তিনি প্রাচীন, আধুনিক ও ব্যতিক্রমধর্মী এক কবি। তাঁর সাহিত্য বিচিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে লিখতে বসে ভাবছি এ অসামান্য কবিকে কোন একটি অভিধায় সীমাবদ্ধ করে বিচার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তিরিশের দশক থেকে আজকের কাব্য-চর্চার বলয়ে তাঁর পরিচয়, বিচিত্র ভাব, ভাষা ও বিষয় নিয়ে বিস্ময়কর এক কাব্য-জগত সৃষ্টি করেছেন, যা প্রাচীনতা, ক্লাসিকেল বিষয় ও রোমান্টিক চিন্তাধারায় এক ব্যাপক ও বিশাল ভাণ্ডার। প্রাচীনতা, মানব-চিত্তের বিচিত্র যুদ্ধতেজী তারুণ্যের স্বপ্নচারিতা এসব কিছুর মধ্যেই তাঁর বিচরণ। একে বোঝা ও বিশ্লেষণে আনন্দ আছে, যদিও পূর্ণ বিশ্লেষণ অনেক গুণী ও বিদ্বজ্জন করে চলেছেন। জটিলতা ও সরলতার মন-মুগ্ধকর তার কল্পনা। সেই সঙ্গে

প্রাচীন কাব্য ধারার বিস্ময় চিত্র যেসব রচনায় পাই, সে সম্বন্ধেই আমার ক্ষুদ্র অনুভূতি প্রকাশ করছি।

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি' পড়েছিলাম কৈশোরে। কাব্য নয়, তার মধ্যে যে জাগরণের ডাক তাই তখনকার পাঠককে জাগিয়ে দিয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বাংলা ভাষাকে দিয়েছিলেন নতুন কাঠামো, পরিচয় এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী লেখার যাত্রাপথ। সেখানে ভিন্ন কাঠামো ও সনেট, ধর্মাধর্ম এবং আধুনিকতা তাঁর চেতনায় এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিলো। নজরলকে আবার আর এক যুগ সন্ধিক্ষণে পাই। তুলনাবিহীন তীব্রতা, জাগরণ ও প্রগাঢ় রোমান্টিকতার সমন্বয়ে নতুন আবির্ভাব হিসেবে হয়তো বা, তাঁর পৌরাণিক বিষয় ও উপকরণ ব্যবহার, ভাষার সেই নবীনতা, চিন্তার ব্যাপকতায় যে শক্তিমত্তা পাওয়া যায়, সেই তীক্ষ্ণ শক্তিময় তরবারী তিনি রেখে গেলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীর জন্য। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' বিশাল বিশ্বে যাত্রার আহ্বান জানায়। নতুন চৈতন্যের জাগরণে পৃথিবীতে ঈগল পাখীর মত তার যাত্রা, শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক। এ যেন প্রাচীন বীর ইউলিসিসের অভিযানের তৃষ্ণা। ফররুখের বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে সিরাজুম মুনীরা, হাতেম তায়ী, নৌফেল ও হাতেম, কাফেলা, হে বন্য স্বপ্নেরা বিশেষ মূল্যায়নের দাবী রাখে। একদিকে যেমন আধুনিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে এ কালোত্তীর্ণ কাব্যগুলির গঠন-প্রকৃতি নির্ভর করছে লোক সাহিত্য, আলিফ লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া, চাহার দরবেশ এর ধ্যান-ধারণা। হাতেম তায়ীর মতো বিমাল মহাকাব্য রচনা করা এক দুঃসাহসিক কাব্যকৃতি। কারণ ভাষা এবং ছন্দের প্রচুর নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এ কাব্যের সৃষ্টি। পুঁথি সাহিত্য থেকে ইতিহাস সৃষ্টিতে তিনি পূর্ণভাবে সফল একারণে যে, এ কাব্যে কোন একঘেয়েমি নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ১৪ অক্ষরের স্থলে প্রতি পদে তিনি আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। এতে ধনি-গাম্ভীর্য বা অর্থের মাধুর্য ক্ষুণ্ন হয় নাই, বরং আরও সু-গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। এভাবেই প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্যেটের ফাউস্টের মতোই হাতেম তায়ীকে মানবতা, ঔদার্য ও মহত্ত্বের প্রতীক রূপে সৃষ্টি করেছেন। অনেকেই তাঁকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একসময় তাঁকে নানাভাবে সংকীর্ণ চিন্তার দোষ দিতেন, কারণ তিনি ইসলামিক জাগরণে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময়ে ভাষার যুদ্ধকে তিনি দেখেছিলেন নতুন আদর্শের গৌরব থেকে। তিনি দুঃখে ক্ষোভে উচ্চারণ করেছেন- "যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান/সংগিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিষ্পাপ অম্লান"-তাঁর মধ্যে যে বিদ্রোহ, তা নানা বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে কবি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেনঃ "সম্মুখে চলার গতি রুদ্ধ

হল, বেদনা বিক্ষত হে জীবন্ত মাতৃভাষা, তুমি হলে মৃত্যুর শিকার।" (চলতি ভাষার পুঁথিঃ মুহূর্তের কবিতা)।

এর সঙ্গে তাঁর লেখনীর প্রবল বৈভব লক্ষ্য করার মতো নৌফেল ও হাতেম কাব্যে তীব্র ক্রোধে নৌফেলের যে উচ্চারণ–"কি হবে এ রাজ্য দিয়ে? চাইনিতো হাতেমের তখত হাতেমের যা আমি চেয়েছি জীবনে।"

এক প্রবল শক্তিমত্তায় বাংলা ভাষা পারস্য, মিশর, আরব সভ্যতার শব্দ অনায়াসে মিশে গেছে বাংলার পংক্তিতে। স্রোতবতী নদীর মতোই তা গতিবেগ সৃষ্টি করেছে তাঁর লেখায়। সেই তেজ নিয়েই কবি বলতে পারেনঃ

ছিড়ে ফেল আজ আয়েশী রাতের
মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও
হে মাঝি সিন্দবাদ
(বা'র দরিয়ায় ঃ সাত সাগরের মাঝি)

কবির রোমান্টিক স্বপ্নচারী মন মাটির বন্ধনে থেকেও ঊর্ধমুখ চাতকের মত সুদূরের পিয়াসী। স্বপ্ন ও জাগরণ, প্রেম-বিরহ, কাম ও লালসা তাঁর লেখায় ঠিক জায়গা করে নিয়েছে। মধ্যরাতে নিৎসঙ্গ ডাহুকের আর্তস্বরের বিষাদ যেমন, তেমনই ছলনার পাশা খেলার বিলাস যে কত অর্থহীন কবি তা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন নি।

কবির মধ্যে রোমান্টিক আলো-আঁধারি যেন লুকোচুরি খেলে। কবি বলেনঃ

নল বনে জোস্নার বাঁশি
ছড়ায় সুরের আস্তরণ
ঝিম হয়ে আসে সেই সুরে সকল আকাশ
নদী বন।
(মধুমতীর তীরেঃ হে বন্য স্বপ্নেরা)

বিস্ময়কর হলেও এটি উল্লেখ করা দরকার যে, কবির মধ্যে ছিলো একজন যোদ্ধা, যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিয়ে পৃথিবীকে দেখতে ভোলেননি। সমকালীন অন্যায়, অনাচারের কথা মনে রেখে তিনি লেখেন ব্যঙ্গ কবিতা। গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাতে ব্যঙ্গ আছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নয়-তাকে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ বলাই সঙ্গত। তিনি উপদেশ দেনঃ

আমার আদর্শ শোনো,
ছাড় পথ সভ্যতা বোধের
জানো তো কুকুর কভু নাহি চাটে
মাংসহীন হাড়।

যেখানে মাংসের গন্ধ
সেখানেই গতি এ দাসের
(অনুস্বার)

কিন্তু ফররুখ আহমদ শুধু একদিক থেকে বিশ্ব পরিব্রাজক নন। তাঁর যাত্রা নানা দিক থেকে জীবনকে দেখেছে। তাঁর সত্তায় প্রকৃতি ও মানুষ সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতায় স্থবির মলিনতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। 'লাশ' কবিতায় তিনি অশালীন সভ্যতার ধ্বংস কামনা করেছেন। দলিত হতমান মানবতার সামঞ্জস্যহীনতা দেখে তিনি উচ্চারণ করেনঃ

এখানে মানুষ ছিলো
আজ শুধু পড়ে আছে শব।
(সমাপ্তি ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা)

এ যুদ্ধ জন-মানুষেরই যুদ্ধ। মাঝে মাঝে তাই কবিও ক্রুদ্ধ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে, তাঁর কবি-হৃদয়ের উপহার বেশ কিছু মনোমুগ্ধকর গানও রয়েছে। শিশুদের জন্য হরফের ছড়া এবং রয়েছে পাখীর বাসা, ঝড়ের গান আরও বহু মনমাতানো শিক্ষামূলক রচনা। মুক্ত বাতায়ন তাঁর হৃদয়কে অবরুদ্ধ করেনি। দীর্ঘদিন ধরে ফররুখ একাডেমীর (ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন) আন্তরিক প্রচেষ্টায় কবিকে প্রকৃত রূপে বোঝার সুযোগ হচ্ছে, এটি অবশ্যই ধন্যবাদের দাবী রাখে। সাহিত্যে ভিন্নমত থাকার কারণে কবিসত্তা ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু কখনও থেমে থাকেনা। অন্তর্লীন শক্তি তাঁকে প্রকাশ করবেই। কবি ছিলেন প্রকৃতির অন্ত রঙ্গতায় নিমগ্ন। তাঁর শব্দবন্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অক্ষর ব্যবহারের পাশাপাশি যে নূতনত্ব তা বিস্ময়কর ও স্বাধীন। কবির কাব্য-প্রকৃতিও তাই দেশ-কাল সীমানায় বন্দী থাকেনি। বিমুগ্ধ প্রকৃতিলগ্ন উপমা ও চিত্রকল্প তুলে ধরতেই হয়। এক গভীর মুগ্ধ তন্ময়তার ছবি।

ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যের রঙ জেগে আছে
তোমার দু'চোখ নীল মেঘমুক্ত আকাশের আলো
(প্রত্যয়ঃ মুহূর্তের কবিতা)

প্রকৃতির বিচিত্র আলো, বিদ্যুৎ, বজ্র, নদী, পাহাড়, সাগর, তরঙ্গরাশি তাঁর কাছে নানা রূপে ধরা দিয়েছে।

কবিকে যতটুকু বুঝেছি, আমার মনে হয়েছে তিনি অভিমানী, প্রত্যয়ী, সাহসী নির্ভিক, নিৎসঙ্গ এক পরিব্রাজক, যাঁর যাত্রা নবনব সূর্যালোকে। বজ্রে-বিদ্যুতে, লৌকিক-অলৌকিকের মিশেলে ধাবমান এক আপোষহীন কবি-চিত্ত। তাঁর সঙ্গে পরিচয় এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তাঁকে বুঝতে গিরে বলতে চাই-কাফেলা কাব্য রচনা করতে গিয়ে একদিকে মরুভূমির পটভূমি যেমন ব্যবহার

করেছেন, তেমনই বৈশাখ, ঝড় এসব কবিতায় বাংলর পাকৃতিক চিত্রকল্পও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করছেনঃ

হে বৈশাখ এস এস স্রষ্টা যিনি লা-শারিক
জব্বার কাহ্হার
তার আজ্ঞাবহ তুমি নিয়ে যাও দেশে দেশে
প্রলয় ধ্বংসের সমাচার ।
(বৈশাখঃ কাফেলা) ।

আবার পদ্মার স্রোত ও গতি দেখে মুগ্ধ কবি বলেনঃ

কি দুরন্ত গতিবেগ, কি উদ্দাম আনন্দ অম্লান
যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে গেয়ে যায় জীবনের গান ।
(আরিচা পার ঘাটেঃ হে বন্য স্বপ্নেরা)

ফররুখ আহমদ এমন এক ক্রান্তিকালকে সাথী করে তাঁর পৃথিবী গড়েছিলেন, যেখানে বিদ্রোহ, ক্রোধ আপোষহীন আদর্শ তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। অথচ সবকিছুর উপরে তাঁর মুক্ত-চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। এ কারণে তাঁর চিন্তা ও লেখা যথেষ্ট বিপরীত এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সব কিছুর ওপরে তিনি একক এক যোদ্ধা, যেন তাঁর বিশ্বাস ও চলমানতায় ব্যগ্র অনুশীলন ও নিরীক্ষায় নিবিষ্ট। সিরাজাম মুনীরায় তাঁর স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। তবে মনে হয় সারা বিশ্বকে অনুভব করার পরে কবি ফিরেছেন নিজের পরিমণ্ডলে, যেমন করেঃ

শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহী পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে
তার পরিচিত নীড়ে। ফিরিল হাতেম তায়ী
শাহাবাদে, প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষ পুটে ।

আমরা জানি, বড় কবি মাত্রই শিকড়-সন্ধানী হবেন। হোমার, আলাওল, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সবার মধ্যে ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ কাজ করেছে। এদিক থেকে ফররুখও ব্যতিক্রম নন। তাঁর ভাষার গাম্ভীর্য, বৈচিত্র্য ও রোমান্টিকতার পাশাপাশি বঞ্চনা-বিক্ষুব্ধ নাবিকের মুখের ভাষা গভীর আবেগে উৎসারিত হয়ঃ

শুনেছি আমার পূরানো মাটির টান
তারার চেরাগে করেছি আমার দিগন্ত সন্ধান ।
(দরিয়ায় শেষ রাত্রি)

অথবা অন্যত্রঃ

অস্থির বিদ্যুৎ তার বাঁকা শিঙে

ভেসে এল চাঁদ
(বন্দরে সন্ধ্যা)
যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দি বিশাল জ্বিন
ছাতি চাপড়ায়ে কেঁদেছিলো কাল সারারাত সারারাত
(দরিয়ায় শেষ রাত্রি।)

এসব চিত্রকল্প ধরে রাখে এক সাবলাইম অনুভবকে। আনন্দের কথা এই যে, আমাদের দেশে ও বাইরেও কবিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত ও চর্চার কাজ শুরু হয়েছে। কবি হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন, তা বোঝার জন্য এই কাজ চলবে এটাই আমাদের আশা। সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন, ব্যাপক পাঠ-চর্চার জন্য স্কুল ও কলেজের পাঠ্য-তালিকায় তাঁর রচনা অবশ্যই অনেক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তাঁর অপূর্ব লেখাগুলি। গানের জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে তাঁর রচিত গান।

কবি ফররুখ আহমদকে চিনেছি তাঁর সাত সাগরের মাঝি থেকে। পাঞ্জেরী কবিতা থেকে। তার যথার্থ সম্মান ও মূল্যায়ন হচ্ছে দেখে ধন্য মনে করছি। এ দেশ যেন তাঁর যোগ্য সন্তানকে যোগ্য জায়গাটি দিতে পারে এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে শেষ করছি। কবির প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি

ফররুখ আহমদ

সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট ব্যবহার করুন। আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদান করুন।

www.farrukhfoundation.net.org

নিয়মিত ফররুখ বিষয়ক মাসিক সেমিনার ও সাহিত্যসভা

প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবার

সময় : বাদ মাগরিব

স্থান: দেওয়ান মঞ্জিল, পুরানা পল্টন

আয়োজনে :

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন

আপনি আমন্ত্রিত

ফররুখ আহমদের গীতিনাট্যঃ আনারকলি

মুহম্মদ মতিউর রহমান

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে নাটক কাব্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কাব্যকে তাঁরা আবার দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন–একটি দৃশ্যকাব্য অন্যটি শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য পাঠের মাধ্যমে রসাস্বাদন করা হয়, তাকে তাঁরা শ্রব্যকাব্য বলেছেন আর যে কাব্য মঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে অভিনয় করে প্রদর্শিত হয়, তা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এরদ্বারা আলংকারিকগণ নাটককে কাব্য সাহিত্যের অন্ত র্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। মূলত পূর্বকালে সাহিত্য বলতে ছন্দবদ্ধ রচনাকেই বুঝাত। তখন গদ্যের জন্ম হয়নি, যদিও আদিকাল থেকে মানুষের মুখের ভাষা গদ্যের আদলেই তৈরী। তবু প্রাচীনকালের সকল ভাষার সাহিত্যই ছন্দবদ্ধ কবিতা। গদ্যের ব্যবহার সবদেশের সাহিত্যেই আধুনিককালে শুরু হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও গদ্যের উদ্ভব ইংরাজ আমলে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বর্তমানে গদ্যরীতি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এবং মানুষের তাবৎ ভাব প্রকাশের জন্য এটা সর্বোকৃষ্ট মাধ্যম।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটক ছন্দবদ্ধভাবে রচিত হলেও তার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাটককে বস্তুনিষ্ঠ রচনা বলা হয়। অর্থাৎ সাধারণ কবিতায় কবি সরাসরি মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু নাটকে কবি থাকেন অন্তরালে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী অথবা চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তু কবিতার আকারে সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ বস্তুনিষ্ঠতা নাটককে সাহিত্যের অন্য সকল শাখা থেকে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আধুনিককালে এ বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে নাট্যকার অধিকতর মনযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্য নাটক শুধুমাত্র ব্যক্তিমনের অভিব্যক্তি নয়, এটা অনেকাংশে সামষ্ঠিক বা সামাজিক অভিব্যক্তি। এতে সমষ্ঠি তথা সমাজের একটি বক্তব্য বা শক্তিশালী ম্যাসেজ ফুটে ওঠে। ফলে নাটকের আবেদন অনেকটা সর্বজনীন এবং ব্যাপকতর হয়। একারণে নাটক একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় সাহিত্য-মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত।

আধুনিককালে নাটকের ভাষা শুধুমাত্র ছন্দবদ্ধ হয়ে থাকেনি। গদ্যে রচিত নাটকই বর্তমানে বেশী রচিত হয় এবং সেটাই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে গদ্য নাটক ছাড়াও গীতি নাট্য, কাব্য নাট্য, নৃত্য নাট্য, সাংকেতিক নাটক

ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর নাটকের একটি আলাদা রীতি-পদ্ধতি রয়েছে। গীতি নাট্য সম্পর্কে জনৈক আলংকারিক বলেনঃ

"অপেরা' (গীতিনাট্য বা গীতাভিনয়) শব্দটি ইটালি হইতে আগত।ইহা মুখ্যত নৃত্যগীত-সম্বলিত নাটক হইলেও গান এই নাটকে গৌণ নহে, মুখ্য। Gay–এর Beggar's Opera নামক নাটকেও সাহিত্যিক অংশটি মুখ্য নহে, গীতিনাট্য সঙ্গীতই ইহার প্রাণ। আমাদের দেশে 'অপেরা' শব্দটি 'যাত্রার' প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।" (শ্রীশচন্দ্র দাশঃ সাহিত্য-সন্দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৪)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, গীতিনাট্যের মুখ্য দিক হলো এর গীতিবহুলতা। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে এ নাটক পরিবেশিত হয়। এক ধরনের কাব্যিক আবহ ও ভাবোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে গীতিনাট্য অভিনীত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের নাটকের উদাহরণ হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'শিরী ফরহাদ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধ্যানভঙ্গ' ও রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'ঋতুউৎসব'-সম্পর্কিত নাটকগুলি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। বাংলা গীতিনাট্য শাখায়ও তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলায় আবহমানকাল থেকে প্রচলিত যাত্রা বা পালাগানের সাথে আধুনিক গীতিনাট্যের যথাযথ তুলনা চলে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যাত্রা ও পালাগান বাংলাদেশের পুরাতন ঐতিহ্য। আধুনিক গীতিনাট্যের প্রচলন ঘটেছে মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে।

ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি। কবিতার বিভিন্ন রূপাঙ্গীকে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গীতি কবিতা, সনেট, মহাকাব্য, শিশুতোষ কাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ-রীতিতে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। তিনি মোট তিনটি নাটক রচনা করেছেন। তার একটি গদ্যে রচিত ব্যঙ্গ নাটক-'রাজ-রাজড়া', একটি কাব্যনাটক-'নৌফেল হাতেম' এবং অন্যটি গীতিনাট্য–'আনারকলি'।

ফররুখ আহমদ রচিত 'আনারকলি' গীতি নাট্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকার ৯ এপ্রিল ১৯৬৬ সনে। এটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'ফররুখ আহমদ' শীর্ষক সংকলনে (১৯৮৭, সেবা, ঢাকা)। ক্ষুদ্রায়তনের এ নাটকটি মোট ৯ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। এতে মোট তিনটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকের অংক-বিভাগের রীতি-পদ্ধতি এ তিনটি দৃশ্যের মধ্যে কৌশলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তনের এ নাটকটিতে এক গভীর অন্তর্ভেদী ও মর্মস্পর্শী মানবিক সংবেদনার শক্তিশালী অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মুঘল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম ও ইরানের শাহাজাদী আনাকলির অসাধারণ প্রেম-কাহিনী ও সে প্রেমের করুণ পরিণতি নিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এতে মোট তিনটি দৃশ্যে ১১ জন চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে। কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে ইরানে এবং এর সময় হলো এক উৎসবের দিন।

প্রথম দৃশ্যে কবি আনারকলি ও তার এক সেহেলি এবং দুজন দ্বাররক্ষীর সংলাপ দিয়ে শুরু করেছেন। দৃশ্যের বর্ণনায় কবি যে গানটি দিয়ে শুরু করেছেন, তা এরূপঃ

ইরানের গুলশান হল উচ্ছল
মেলে আঁখি নার্গিস: জাগে শতদল ॥
পাতায় পাতায় ঘাসে
শিশির কণিকা হাসে,
নিশীথের শবনম
হ'ল উচ্ছল ॥
শুরু হ'ল খোশরোজে খুশীর খেলা,
গোলাবের পাপড়িতে রঙের মেলা ॥
শোনে মন উন্মন
মৌমাছি গুঞ্জন
এ খুশীর খোশরোজে
চির চঞ্চল ॥

উপরে ইরানের ঐতিহ্যবাহী 'নওরোজ' উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নওরোজ সাধারণত ইরানের বসন্তকালের শুরুতে উদ্‌যাপিত হয়। তখন প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হয়ে আনন্দ-চঞ্চল ও মনোরম হয়ে ওঠে। প্রকৃতির আনন্দ মানুষের মনেও খুশির বন্যা বইয়ে দেয়। সে খুশির প্রতিফলন ঘটে মানুষের মনে, বিশেষত প্রেমিক-প্রেমিকারা সে আনন্দে চঞ্চলিত হয়। এখানে বিশেষভাবে কয়েকটি ফারসি শব্দের ব্যবহারে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরো মনমুগ্ধকররূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন-গুলশান, নার্গিস,শবনম,খোশরোজ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ইরানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যময় চিত্র মনমুগ্ধকররূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর পরিবর্তে অনুরূপ বাংলা শব্দের ব্যবহারে তা কখনো সম্ভব হত না। অতএব স্থান ও বাস্তবতার কারণে কবি এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তাঁর নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

উপরে সৌন্দর্যময় প্রকৃতি ও উৎসবের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে আনাকলির চিত্ত সাড়া দেয়নি, কারণ এক গভীর শংকা ও উদ্বেগের ফলে তার চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সে তার ঈপ্সিত প্রেমিকের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এ উৎসব-মুখর রাত্রিবেলায় সকলের অলক্ষ্যে তাকে বিপদ-সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে তার প্রেমিকের কাছে দূরদেশে যাত্রা করতে হবে। তাই তার মন উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এটা দেখে তার সেহেলি তাকে জিজ্ঞাসা করছে:

"কি কথা বলিস? শোন সেহেলি
সকলে যখন উঠেছে মেতে,
খোশরোজে তোর বাধা কি যেতে?"

সেহেলির এ কথায় উদ্বিগ্ন আনারকলি উদ্বেগের সাথে বলল:

"লক্ষ বিপদ ঘিরেছে যারে
যেতে হবে যাকে এ দেশ ছেড়ে
এ খুশীর খেলা সাজে না তার।"

একথায় সেহেলিও রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে:

"কোন দূর দেশে যাবে সেহেলি
সে দেশে কি হায় দুঃখ নাই?"

এর উত্তরে আনারকলি বলে:

"কি আছে উপায় মজলুমের
আলোর ইশারা খুঁজে না পাই।"

সে তখন বলে:

"কাফেলার পথ নাই তো জানা,
তবু শুনবে না তুমি এ মানা
আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

এর উত্তরে আনারকলি বলে:

"দূর সুদূরের পথে কাফেলা
ডেকেছে আমাকে অস্ত বেলা,
বিদায় ইরান।–খোদা হাফেজ ॥"

আনারকলি তার অন্তরের ডাকে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু সে তাঁর ঠিকানা জানেনা, গন্তব্যে পৌঁছার সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধানও তার জানা নেই। তবু অন্তরের ডাকে তাকে সেখানে যেতেই হবে। তার সেহেলিও এভাবে আনাকলিকে একাকী নিরুদ্দেশের পথে যেতে দিতে রাজি নয়। তাই সে তার সঙ্গী হয়। শুরু হয় নিরুদ্দেশের পথে অভিযাত্রা। এভাবে

কাহিনী এক বিশেষ Suspense বা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। কাহিনীর সূত্রপাত এবং প্রথম দৃশ্যের প্রথম ভাগের সমাপ্তি ঘটে এখানেই।

এরপর নাটকের প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের শুরু। কাফেলা এগিয়ে চলেছে। কাফেলার সাথে সঙ্গতি রেখে আবহ সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে। সঙ্গীতটি এরকম:

দিন রজনীর পথে চলে এই কাফেলা
নিত্য ভাসি আঁখি জলে এই কাফেলা ॥
দুঃখ রাতের বেসাত নিয়ে চল্‌ছে হায়
রাতের ছায়া নামলে কাল দিনশেষে
খুঁজবে কি সুর তারার দলে এই কাফেলা ॥
চলার তালে হাজার পথের বাঁক ঘুরে
পাবে কি ভোর ফুল–ফসলে এই কাফেলা ॥
কেউ জানে না কোন্ সে বিজন দূর দেশে
ঠাঁই পাবে কোন আকাশ তবেল এই কাফেলা ॥

আবহ সঙ্গীতের সাথেই প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের পরিসমাপ্তি ঘটে। কাফেলা ইরানের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে মুগল সম্রাটের সীমান্তের মধ্যে এসে পড়েছে। সীমান্তরক্ষীরা কাফেলাকে থামতে বলে। আগন্তুকদের পরিচয় জানার জন্য এবং তাদের সঙ্গে যা কিছু আছে তা যথাযথরূপে অনুসন্ধান করার জন্য কাফেলাকে থামতে বলে। সীমান্তরক্ষীদের জবাবে কাফেলা-সালার বলে:

"দূরে যাও, দূরে যাও....
এ কাফেলা নয় পণ্যের
এ কাফেলা নয় স্বর্ণের
এ কাফেলা চলে তক্‌দির সন্ধানে।"

এর উত্তরে সীমান্তরক্ষী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে:

"কে ঐ রূপকুমারী
কেন নিয়ে যেতে চাও
বুঝিতে না পারি;
ফিরে যাও কাফেলা-সালার।"

উত্তরে কাফেলা-সালার জবাব দেয়:

"আছে আছে গিরি–কান্তার
পথ রেখা নাই ফিরিবার
যে নারী চলেছে সাথে
নিয়ে আঁখি নীর

তার দুরাশায় জাগে
তার তক্‌দির।"

এতে সীমান্তরক্ষী বুঝতে পারে যে, এ কাফেলা কোন সাধারণ কারণে নয়, বরং অন্তরের গভীর প্রেরণায় নিজের তক্‌দির পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করেছে। অতএব, সীমান্তরক্ষীরা প্রেমিকা নারীর মনঃষ্কামনা পূরণের জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং অনেকটা আশীর্বাদের সূরে বলে:

"চলে যাও কাফেলা-সালার।
দুঃখের কাল মেঘে
হয়তো বা দেখা দেবে
ক্ষণিকের সুখ স্বর্ণাভা।"

প্রথম দৃশ্যের শেষ এখানেই। এরপর দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ দৃশ্যের সূত্রপাত ঘটেছে হিন্দুস্থানের এক জনবসতিপূর্ণ বাজারে। সাধারণত বিদেশ থেকে কোন কাফেলা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য নিয়ে প্রথমত এ বাজারেই প্রবেশ করে সওদাগরদের কাছে তা বিক্রি করার জন্য। সওদাগরেরাও সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিদেশী পণ্য ক্রয়ের আশায় অপেক্ষা করে। কাফেলা আশার সঙ্গে সঙ্গে তাই অপেক্ষমান সওদাগরেরা কাফেলাকে ঘিরে তাদের কাছে কী কী পণ্য আছে, তা জানার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। তাদের প্রশ্ন:

"ইরানের কোন্ সওদা এনেছ সাথে?
গালিচা?
শারাব?
খঞ্জর?
শামশির?
আনো নাই বাঁদী হাসিন খুব সুরাত?"

তখনকার দিনে প্রাচীন ঐতিহ্যেপূর্ণ ইরান থেকে যেসব পণ্য হিন্দুস্থানে আসত, উপরে সেসব পণ্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে। সওদাগরদের এ প্রশ্নের জবাবে কাফেলা-সালার সে একই কথা বলে যে, এটা কোন পণ্য বা স্বর্ণ বহনকারী কাফেলা নয়। এ কাফেলা তক্‌দিরের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েছে। এরপর সওদাগরের জিজ্ঞাসা:

"সুন্দরী নারী কে ঐ পরীর মত।
ওর পরিচয় দিয়ে যাও অন্তত।"

এর জবাবে কাফেলা-সালার অনেকটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে:

"হৃদয় যদি না চিনে নেয় হৃদয়েরে
পারবে না কেউ চিনতে কখনো এরে।"

এ জবাবে সওদাগরেরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদের মনে রহস্যের সৃষ্টি হয়। তাই তারা বলে:

"এখানে পাবে না ছাড়া
যেতে হবে শাহী দরবারে।"

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম ভাগের সমাপ্তি ঘটে এখানেই। এরপর শাহী দরবারে কাফেলাকে নিয়ে হাজির করা হয়। শাহাজাদা সেলিমের সামনে উপস্থিত হয়ে সওদাগর তার সমীপে আরজ করে যে:

"শোন ফরিয়াদ বাদশাজাদা
চলেছিল দূরে এই কাফেলা
সাথে নিয়ে নারী অপরিচিতা।"

এর জবাবে কাফেলা-সালার বলে:

"নহে লুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠিতা নারী
যে এসেছে তার তকদির সন্ধানে।"

এ কথা শুনে শাহাজাদা সেলিম বলে:

"চিনেছি, চিনেছি আমি
আমার আত্মার
সকল রোশ্‌নি দিয়ে চিনেছি নারীকে,
খুঁজিয়াছি যারে আমি
এল সেই জোহরা সিতারা।"

শাহাজাদা সেলিমের কথা শুনে আনাকলি আশ্বস্ত হয়। সে দীর্ঘদিন তার মনের অপূর্ণ স্বপ্ন-স্বাধ পূরণের জন্য যে বিপদ-সংকুল অজানা পথ কায়-ক্লেশে পাড়ি দিয়েছে, আজ বুঝি তা পূরণ হয়েছে এবং সে তার মঞ্জিল মকসুদে পৌঁছে গেছে। তাই অনেকটা স্বস্তি ও নির্ভরতার সাথে বলে:

"মন যার আশ্রয় পিয়াসী
চিনিয়াছো সেই অচেনারে
দূর যাত্রা পথে কাফেলার।"

আনারকলির একথা শুনে সেলিমের অতৃপ্ত প্রেমিক মনে আশ্বস্তি আসে। তাই সে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরম প্রেয়সীকে পাওয়ার আনন্দে তাকে সাদরে নিজ হেরেমে স্থান দেয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের সমাপ্তি এখানেই। এরপর তৃতীয় ভাগের শুরু। কিছুকাল শাহাজাদার হেরেমে তার গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরম শান্তি ও পরিতৃপ্তির মধ্যেও এক গভীর অতৃপ্তির বেদনা তার মনকে অস্থির করে তোলে। এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত একটি কবিতার কয়েকটি চরণের কথা উল্লেখ করা যায়। কবি বলেছেন, "যাহা চাই তাহা ভুল

করে চাই /যাহা পাই তাহা চাই না।" প্রকৃত প্রেমের এটাই যেন প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। উদ্দিষ্ট প্রাপ্তির আশায় প্রেমিক-প্রেমিকা যতটা ব্যাকুল হয়, পাওয়ার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে অতৃপ্তি-অধরা ও না পাওয়ার বেদনায় পর্যবসিত হয়। তখন প্রেমিক-প্রেমিকা যেন তা থেকে মুক্তির আশায় দিন গুণতে থাকে। মুঘল হেরেমে পর্যাপ্ত আরাম-আয়েশ ও শাহাজাদার গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও আনারকলি এখন মুক্তির আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শাহাজাদা সেলিমও তার কাঙ্ক্ষিতা প্রেমিকাকে একান্ত করে পেয়েও তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে শেষ হয়নি, সে আরও পেতে চায়, এক অতৃপ্তির গভীর দহনে তার হৃদয় যেন দগ্ধীভূত হতে থাকে। উভয়ের সংলাপ থেকে তাদের মনের এ সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

আনার ॥ "নিঃশেষে আমি দিয়েছি ছিল যা মোর
এখনো তোমার তৃষ্ণা কি মেটে নাই?"

সেলিম ॥ "পিপাসা আমার বেড়ে যায় অবিরত
অন্তবিহীন মরু সাহারার মত,
চেয়োনা জানিতে অকারণে পিছু ডেকে
দাও আরো দাও রূপের সুরাহি থেকে।"

আনার ॥ "সুপ্ত মনের পল্লবদল খুলি
যা ছিল আমার দিয়েছি তো সব তুলি।"

সেলিম ॥ মনে তবু উন্মনা উদাসিনী
কিছু দিলে আর কিছু বুঝি নাহি দিলে,
পেয়েছি তোমাকে মোগল হেরেমে, তবু
মন আছে তব আর কোন্ মন্‌জিলে

আনার ॥ হয়তো বুঝেছ, হয়তো বা বোঝ নাই
শ্রান্ত জীবনে এবার জানতে চাই,
ক্লান্ত আমি এ মোগল হেরেমে আজ
ইরানী হাওয়ায় মুক্তিপরশ চাই।

সেলিম ॥ কাছে এলে তবু ওগো বিদ্যুৎশিখা
চিরদিন তুমি রয়ে গেলে প্রহেলিকা।

এখানে নাটকের ক্লাইম্যাক্স শুরু হয়েছে। আনারকলি তার প্রেমাস্পদকে পেয়ে তাকে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার পরও মনে এক গভীর অতৃপ্তি অনুভব করছে। জন্মভূমি ইরানের মুক্ত হাওয়ার পরশ পেতে তার মন উন্মন হয়ে উঠেছে। তাই মুঘল হেরেমের সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ এবং সেলিমের গভীর প্রেমের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার মন

ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শাহী পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে সে যেন বন্দী হয়ে পড়েছে। তাই তার মন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। যুবরাজ সেলিমের গভীর প্রেম ও আদর-সোহাগ তার মনের এ অতৃপ্তি দূর করতে পারছে না। ফলে হেরেমের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে ইরানের মুক্ত আলো-হাওয়ার পরিবেশে তার মন ছুটে যেতে চায়। আনারকলির মনের এ অবস্থা উপলব্ধি করে শাহাজাদা সেলিমের মনেও অতৃপ্তির বেদনাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। সে মনে করছে আনারকলি হয়তো তাকে সবটা দিতে পারেনি, তার মন হয়তো আরও অন্যখানে অন্যকারো কাছে বন্দী হয়ে আছে। একথা ভেবে সেলিমের মনেও নানা প্রশ্ন-সংশয়-সন্দেহ ও সংক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আনারকলির বিদ্যুৎ শিখার ন্যায় রূপের আগুনে নিজেকে পুড়িয়েও সে যেন তাকে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। সে তার কাছে অধরাই রয়ে গেছে। আনারকলিকে তার কাছে 'প্রহেলিকা' বলে মনে হচ্ছে। ফলে সে অনেকটা ক্ষোভ ও অভিমান করে দূরে চলে যায়। আনারকলি তখন হেরেমে রক্ষিত পিঞ্জরে হিরামন পাখির কাছে গিয়ে তাঁর মনের আরজু পেশ করে:

"খাঁচার বাঁধন দিলাম খুলে
শোন হিরামন
ইরানী সেই তূতীর কানে
বোলো নিশুত রাতে
সেহেলি তার বন্দিনী আজ
মোগল হেরেমে ॥"

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন রূপকথা জাতীয় গল্প-কাহিনীতে 'হিরামন', 'তূতী', 'কবুতর' ইত্যাদি নানা জাতীয় পাখির উপস্থিতি অনেকটা অবশ্যম্ভাবী। এসব পাখির মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের মনের কথা দূরবর্তী স্থানে ঈপ্সিত প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে পৌঁছে দেয়। তখন ডাক-ব্যবস্থা অথবা আধুনিক যুগের টেলিফোন, মোবাইল বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু মানুষ চিরকালই তার মনের নিগুঢ় কথা দ্রুত দূরবর্তী আপনজনের নিকট পৌঁছাতে চায়। একারণে প্রাচীন ও মধযুগে এসব পাখির ব্যবহার অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে হয়। বিশেষত অবলা নারীর জন্য এটি এক মোক্ষম মাধ্যম হিসাবে সেকালে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। পাখিরাও যেন মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে এবং তার প্রিয় মানুষের কথা অন্যের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

কিন্তু প্রেমের পথে নানা বাঁধা। প্রেমের পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মুক্তির পথও নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ। তাই আনারকলি হিরামন পাখিকে খাঁচা থেকে বের

করে তাকে দূত হিসাবে ইরানে প্রেরণের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অন্যের চোখে সে ধরা পড়ে যায়। এরপর রত্মা ও আনারকলির মধ্যকার কথপোকথন:

রত্মা ॥ অপরূপ ইরানী তূতীরে
বন্দী কে করেছে এনে এ বালাখানায়,
নারী আমি,
তবু আজ মন ফিরে চায়
পুরুষের রূপ ধরি জানাতে প্রার্থনা।
আনার ॥ কে তুমি? কি চাও এখানে বল
বুঝিতে না পারি কিছু তার।
রত্মা ॥ আমি রত্মা অচেনা তোমার।
কোন মায়াবিনী তুমি বিশ্বের সুষমা
তনু দীপাধারে তব রাখিয়াছো জমা
ঘন অন্ধ নিশীথের উজ্জ্বল তারকা?
আনার ॥ অচেনা? অচেনা নহে, সেহেলি আমার
মুক্ত কর পথ মোর বাহিরে যাওযার,
শ্বাস রোধ হয়ে আসে মোগল হেরেমে।
রত্মা ॥ কোস্নে ও কথা কোস্নে,
আত্মঘাতিনী হোস্নে
ওরে বন্দিনী এখানে যে কেউ
স্বপ্নে ও কথা বলে না;
ভুলেও ও পথে চলে না ॥
আনার ॥ শুনবো না আমি শুনবো না,
শাহী তখ্তের আড়ালে মনের
রঙিন স্বপন বুনবো না,
মোগল হেরেমে শুধু অপমান,
মেলে না এখানে মানুষের প্রাণ,
পাথরের মত ঘিরে আছে হায়
জুলুমশাহী ॥

এভাবে অসহায় নারী অচেনা রত্মাকে পেয়ে তার মনের দুঃখ-বেদনা ও গোপন পরিকল্পনার বিষয় বলে তা বাস্তবায়নে রত্মার সাহায্য প্রার্থনা করে। নাটকের ক্লাইম্যাক্স বা জটিলতা এতে আরও ঘনীভূত হয়। উভয়ের কথপোকথনের সময় গুপ্তচর উঁকি মেরে তাদের সব আলোচনা ও ষড়যন্ত্রের কথা শোনে। এর

যে কী কঠিন পরিণতি হতে পারে তা আনারকলি বুঝতে না পারলেও রত্মার বুঝতে দেরি হয় না। তাই রত্মার উক্তি:

"হায় হায় হায়
একি ভুল তুই করলি?
গুপ্তচরের কানে গেছে কথা,
সে তো বুঝবে না এই ব্যাকুলতা;
নিজের দোষে যে মরলি।"

মোগল হেরেমের কঠোর রীতিনীতি রত্মার জানা আছে। তাই সে শংকিত হয়ে পড়েছে। এখানেই দ্বিতীয় দৃশ্যের তৃতীয় ভাগের সমাপ্তি।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের চতুর্থ ভাগে রত্মার মনের গভীর শংকা কঠোর বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল। দরজায় মোগল সম্রাট আকবর ও তার পুত্র যুবরাজ সেলিম আবির্ভূত হলেন। এতদিন পর্যন্ত মোগল হেরেমে আনারকলির উপস্থিতি বাদশাহ আকবর জানতেন না। আজ গুপ্তচরের নিকট অকস্মাৎ সব কথা শুনে আনাকলিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বাদশাহী মেজাজে উচ্চারণ করেন:

"পথ–প্রান্তে নেমে
কারে আনিয়াছো তুমি মোগল হেরেমে?
সে তোমার যোগ্য নহে, তুমি ঊর্ধ্বে তার।"

একথা শুনে যুবরাজের মনে কঠিন আঘাত লাগে। সে আনারকলিকে যেভাবে পেয়েছে এবং তার রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমে যেভাবে মুগ্ধ ও সমর্পিত হয়েছে, তা সম্রাটের অজানা। তাই সম্রাটের কথার প্রতিবাদ করে সে বলে:

"নহি আমি যোগ্য তার
বাদশা নামদার,
অনাদৃতা যে গোলাপ ছিল গুলশানে
ফুটেছে সে এ জীবনে বিপুল সম্মানে।"

যুবরাজের কথা শুনে সম্রাট ক্রুদ্ধস্বরে বলেন:

"মায়াবিনী সে তোমাকে টেনেছে বিপথে
গুপ্তচরী সেই নারী তুমি তা জানো না।"

যুবরাজ এ কথারও প্রতিবাদ করে বলে:

"গুপ্তচরী নহে নারী,
বঞ্চিত বাসনা
করিয়াছে ওরে অন্যমনা!
ইরানের হরিণীও
শাহী মহলের কথা

কিছু শেখে নাই।"

আকবর তখন বাদশাহী মেজাজে দর্পভরে বলেন:

"মানে না যে মর্যাদা রাজার
পাবে সাজা, পাবে দণ্ড তার
মোগল হেরেমে তার
স্থান নাই, কোন স্থান নাই।"

বিপুল ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী বাদশার হুকুম অমান্য করার অধিকার কোন মানুষের নেই। রূপবতী প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা উপলব্ধি করার শক্তি ক্ষমতাধর বাদশার থাকার কথা নয়। যুবরাজের গভীর প্রেমের মূল্যও তার কাছে নেই। বাদশার দৃষ্টিতে মানুষের মাত্র দুটি পরিচয়– হয়তো সে বাদশার একান্ত অনুগত; নাহলে সে শত্রুপক্ষের অনুচর অথবা শত্রু। এর বাইরে বাদশার কাছে মানুষের আর কোন পরিচয় নেই। তাই এখানে আনারকলি ও সেলিমের মানবিক পরিচয় ও তাদের গভীর প্রেমের কোন মূল্য নেই। কিন্তু প্রেমিক সেলিম বাদশার এ অন্যায় হুকুম মানতে নারাজ। এ পর্যায়ে বাদশাহ ও যুবরাজের মধ্যে যে কথপোকথন হয় তাতে মুগল সম্রাটের কঠোর নিয়ম-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে তাই সে সংলাপগুলো তুলে ধরছি :

সেলিম ॥ বিচারের এই প্রহসন!
বলদর্পী বাদশার
একি তিক্ত অবিচার
মুছে দেয় নিষ্পাপ জীবন?
আকবর ॥ এ আদেশ মোগল বাদশার,
এ আদেশ হুকুমত যার।
সেলিম ॥ মানি না, মানি না আমি এই অবিচার।
আকবর ॥ মূর্খ পুত্র।একি জানা নাই
বজ্রদৃঢ় আদেশ আমার?
সিন্ধু যদি ফিরে যায়
ফিরিবে না তবু আর
এই দণ্ড মোগল বাদশার।
বিষপাত্রে মৃত্যু হবে তার।
সেলিম ॥ দাও সেই বিষ পাত্র
নিঃশেষে করি আমি পান।
আকবর ॥ প্রতিফল পাবে প্রতিদান

যদি আনো ধৃষ্টতা তোমার;
শাস্তি পাবে সেই কুহকিনী
রাজরোষে বন্দিনী আনার ॥

বাদশাহ আকবরের কঠিন হৃদয় যুবরাজের কথায় এতটুকু বিচলিত হয় না। একজন সুন্দরী অবলা প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের গভীর মর্মজ্বালা সম্রাটের কঠোর আদেশের কাছে নিতান্ত মূল্যহীন। মানবিক মূল্যবোধ ও চিরন্তন প্রেমের মহত্তম আদর্শ দুনিয়ার ক্ষমতাধর নৃপতির হৃদয়হীন কঠোর আদেশের সামনে নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে এখানেই।

এরপর নাটকের তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যে বিষ পানে আনারকলির করুণ মৃত্যুবরণের মর্মন্তুত দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে। তবে সেখানেও নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। নানা Suspense ও নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কাহিনী চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

নাটকের শেষ দৃশ্যের প্রথম ভাগ। সময় রাত্রির শেষ প্রহর। স্থান মোগল সম্রাটের কারাগার, প্রহরীরা প্রহরায় রত। যুবরাজ সেলিমের চোখে ঘুম নেই। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে সে ব্যাকুল চিত্তে রাত্রির শেষ প্রহরে তার প্রেমাস্পদীর কাছে ছুটে এসেছে। প্রহরারত প্রহরীদেরকে বুঝিয়ে সে কারাগারে প্রবেশের সুযোগ পায়। কারাগারে প্রবেশ করে সে সরাসরি আনাকলির কক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে বন্দী প্রেমিকার সাথে তার যে কথপোকথন হয় তাতে চিরন্তন প্রেমের ব্যর্থতা ও মর্মন্তুদ বেদনার নিষ্করুণ কাহিনীই ফুটে উঠেছে মাত্র। মৃত্যু পথযাত্রী আনাকলি ও তার প্রেমে ব্যর্থ যুবরাজের মধ্যকার আলাপচারিতা চিরকালীন মানুষের গভীর হতাশা ও বেদনারই বহিঃপ্রকাশ। এখানে তা উদ্ধৃত হলো:

সেলিম ॥ শেষ দীপ নিভিবার আগে
এসেছি আনার শেষ রাতে?
আনার ॥ এসেছো, এসেছো এই রাতে?
নেভে নাই জোহরা সিতারা
ফোটে নাই গোলাব কুঁড়িরা
মরণের হিম সজ্জাতে।
এস এস তুমি এই রাতে।
সেলিম ॥ ক্ষমা নেই যে পাপের
অপরাধী আমি সেই পাপে,
তিক্ত মোর অক্ষমতা
আনিয়াছি এ ব্যর্থতা;

ঝরে ফুল সেই অভিশাপে।
আনার ॥ মুছে নাও মনের ম্লানতা,
ব্যর্থ গ্লানি যাও ভুলে যাও,
শেষ নিমেষের পাত্র
পূর্ণ করি আজ তুলে দাও।
সেলিম ॥ দীপশিখা নিভে যায় যাস
আমি সে ক্লান্ত শামাদান,
গোলাবের দিন শেষে হায়,
বণ্টক-ক্ষত গুলশান
সুখ-স্মৃতি সুদূরে উধাও ।

এরপর ঘটনাস্থলে জল্লাদের উপস্থিতি। জল্লাদ বাদশাহর হুকুম ত্বরিত্ গতিতে সম্পন্ন করতে চায়। কিন্তু যুবরাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে জল্লাদ তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে যুবরাজকে কঠোরভাবে বাদশাহর হুকুমের কথা শোনায়। যুবরাজ এতেও নিবৃত্ত না হলে জল্লাদের ইশারায় প্রহরীরা যুবরাজকে জোরপূর্বক বন্দী করে। এর পরের ঘটনা যেমন সহজ তেমনি করুণ। জল্লাদ বিষের পাত্র আনারকলির হাতে তুলে দেয় এবং সেও মুহূর্তের মধ্যে তা পান করে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। শেষ দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের এখানেই সমাপ্তি।

এরপর শেষ দৃশ্যের তৃতীয় ভাগে আনারকলির কবর দেখানো হয়েছে। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ব্যথিত ব্যাকুল চিত্তে সেলিম তার প্রেমাস্পদীর উদ্দেশ্যে যে সংলাপ উচ্চারণ করেছে, তার মধ্য দিয়েই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ সংলাপে মানবিক চিরন্তন আবেদন ফুটে উঠেছে। এ ট্র্যাজেডি নাটকের বিষাদময় আবহ সৃষ্টি হয়েছে এর মাধ্যমে:

সেলিম ॥ মৃত্যুর সমাধি অতলে
সে আজ ফেলেছে হিমশ্বাস,
শিয়রে কাঁদিছে তার
সীমাহীন রাতের আকাশ।
নিরাশা শ্রান্ত মন
জাগে যার মরণ আঁধারে
জীবনের চাওয়া তার
কেঁদে যায় প্রিয়ার মাজারে ॥

'আনারকলি' গীতিনাট্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য প্রতিভার এক বিশেষ দিকের উন্মোচন ঘটেছে। তিনি প্রধানত কবি। নাটকের ভাব ও বিষয়কে তিনি

এখানে ছন্দময় কবিতার ভাষায় অপরূপ গীতিমালায় সাজিয়ে তুলেছেন। কাহিনীর বিন্যাসে নানা চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য ও বর্ণনার অবতারণা ঘটলেও নাটকের কাহিনী এক অবিচ্ছেদ্য ও সংহত রূপ লাভ করেছে। নাটকের ভাব ও বিষয় চিরন্তন মানবিক উপাখ্যানে পূর্ণ। তাই এর ভাব ও কাহিনী পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত করে, রুদ্ধশ্বাসে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাহিনীর পরতে পরতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আকস্মিকতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পাঠকের মনে সর্বদা একটা Suspense সৃষ্টির মাধ্যমে নাটকের ঘটনা প্রবাহের সাথে তাকে একাত্ম করে নেয়। শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটায় এর আবেদন আরো গভীর ও নিবিড় হয়েছে। ইংরাজ কবি পি,বি, শেলী যেমন বলেছেন- "Our Sweetest songs are thouse that tell of saddest thoughts."

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আনাকলি গীতিনাট্যও তেমনি পাঠকের মনে এক গভীর বেদনা মিশ্রিত আনন্দের সঞ্চার করেছে। তাই এটা তাঁর একমাত্র গীতি নাট্য হলেও তা যে বিশেষভাবে সফল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের কয়েকটি মূল্যবান প্রকাশনা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউলণ্যাহ্‌ রচিত

বাংলা কাব্যে ফররুখ আহ্‌মদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ রচিত উপমাশোভিত ফররুখ

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

কবি ফররুখ আহ্‌মদের কাব্যগ্রন্থ সিরাজাম মুনীরা

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

The English Translation of Some Selected Poems of **Farrukh Ahmad (Enlarged Second Edition)**

by Abdur Rashid Khan Price: 100.00 Taka.

ফররুখ একাডেমী পত্রিকা

কবি ফররুখ আহমদ বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা (প্রতি সংখ্যা)

পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন

৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ০১৮১৯৪২০৪৮৯

শিশু-সাহিত্যের প্রিয় কবি ফর্‌রুখ আহমদ

আশরাফ জামান

এক. শিশু-কিশোরদের যদি জিজ্ঞেস করি কাজী নজরুল ইসলামের পরে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় কবি কে? তবে নিশ্চয়ই বলবে ফর্‌রুখ আহ্‌মেদ। ছোটদের প্রিয় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কথাই আজ বলবো।

মুসলমান জাতিকে অনুপ্রেরণা জোগানোর উদ্দেশ্যে এই কবি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, তাহজীব ও তমদ্দুনের উপর ভিত্তি করে লিখতে শুরু করলেন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি'। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত এক নতুন জীবনধর্মী অনুপ্রেরণামূলক কবিতা লিখলেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি জাতীয় আদর্শের পতাকা সমুন্নত করলেন। তাঁর আদর্শ হলেন স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহর দ্বীন ও রসূলের আদর্শ হলো তাঁর কবিতার উৎসস্থল ও অনুপ্রেরণা। আর এ পথে যদি বাধা আসে মৃত্যু ভয় আসে তবু ভীত হয় না বীর। তাঁর ভাষায়ঃ

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্ত হেসে উঠে যবে জিন্দিগানি।

শিশু-কিশোরদের জন্য কবি ফর্‌রুখ আহমদ লিখেছেন অজস্র কবিতা, ছড়া, কাহিনী কাব্য, স্কুলপাঠ্যসহ মোট পঁচিশটি গ্রন্থ। তাঁর জীবনকালে চারটি শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া নয়াজামাত নামে চারটি খণ্ডে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ পায়। কবির মৃত্যুর পর ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'পাখীর বাসা' কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রথম প্রকাশিত শিশু-কিশোর কাব্য। ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে ৪১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে পাখীর বাসা, ঘুঘুর বাসা, বকের বাসা, প্যাঁচার বাসা, টুনটুনী, ফিঙে পাখী উল্লেখযোগ্য ছড়া। কবি লিখেছেন-

আয়গো তোরা ঝিমিয়ে পড়া
দিনটাতে
পাখীর বাসা খুঁজতে যাবো
একসাথে ॥

(পাখীর বাসা ঃ পাখীর বাসা।)

'পাখীর বাসা' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ও ছড়া পাখীদের নিয়ে। এ পাখী আমাদের দেশের সাধারণ পাখী যাদের আমরা প্রতিদিন দেখে থাকি। পাখীরা কোন বাসায় থাকে, কি বিচিত্র তাদের জীবন-প্রণালী কবি তা সহজ ভাষায় শিশুদের উপভোগ্য করে রচনা করেছেন। পাখীর বাসা কবিতাতে প্রথমেই শিশু কিশোরদের পাখীর বাসা খোঁজার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এতে শিশুরা মুগ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলার পাখ-পাখালি এবং বন-বনানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্যোগ যেন। কবিতাগুলোতে ভাষা ও ছন্দ সহজ-সরল এবং অন্ত্যমিলযুক্ত যা অনায়াসে শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। এর কোন কোন কবিতায় আছে হালকা হাস্যরস ও কৌতুকের আবহ।কবি আরও লিখেছেনঃ

মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁকড়া এই
ক্যাবলা বোঝে সেই সাঁঝেই
দেয় সে তখন মাথায় হাত;
মেলায় যাওয়ার এ বরাত ॥
(মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁকড়াঃ ঐ।)

কবির প্রকাশিত দ্বিতীয় ছড়ার বই 'হরফের ছড়া' ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। এখানে প্রত্যেকটি বাংলা বর্ণ নিয়ে এক একটি ছড়া কবি রচনা করেছেন। এগুলো এতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় যে শিশুরা এসব ছড়া পড়ে সহজেই বাংলা বর্ণমালা লিখতে পারে। যেমন–

ক-য়ের কাছে কলমি লতা
কলমি লতা কয়না কথা
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমি ফুলের রঙ দেখে।

১৯৬৯ সালে কবি ফর্‌রুখ আহমদের 'নতুন লেখা' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে আহমদ পাবলিশিং হাউজ। গ্রন্থটিতে ৬৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে মেঘের ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, ইলশে গুড়ি, ইলিশ, রুই-কাতলা, সবাই রাজা, হোঁদুল কুৎকুৎ, ঈদের কবিতা, মাছি, মশা, ছাগল, ষাঁড়, বাঘের মাসী, নৌফেল ও বাদশা হাতেম তায়ীর কিসসা, রাসূলে খোদা, মদীনায় নূরনবী শিশুদের নবী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'নতুন লেখা' গ্রন্থের কবিতা ও ছড়াগুলোতে কবি বিচিত্র রকমের বিষয়বস্তু তুলে এনেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ছড়া ছন্দ অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। এ ছন্দ গ্রামে-গঞ্জে নারী-পুরুষ মুখে মুখে ব্যবহার করতো। গ্রাম্য মেয়েরা ধান শুকাতে,

ধান ভানতে, বিয়ে শাদীতে বা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সুর করে ছড়া গাইতো, যা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় ছন্দই পরবর্তীকালে কবিতা ও ছড়ায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তার নতুন লেখা গ্রন্থে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের হাসির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেনঃ

হো হো হাসি, হি হি হাসি
শুনি হাসির হর্‌রা
বাঁকা হাসি পিঠের উপর
পরে যেমন দোর্‌রা।
কাষ্ট হাসি দেখে কারো
যায় যে জ্বলে পিত্ত,
কাষ্ট হাসির মহড়াটা
চলছে তবু নিত্য!
(হাসি ঃ নতুন লেখা।)

দুই. সে আমলে পদ্মা মেঘনায় জেলেরা ধরতো ধুম করে ইলিশ মাছ। বাংলার ঘরে ঘরে বর্ষা মরশুমে কৃষক, শ্রমিক, ধনী–গরিব সকলের বাড়িতে চলতো সে ইলিশ মাছ খাওয়ার ধূম। কবি ফররুখ আহমদ শিশুদের জন্য সহজ-সরল ছড়ার ছন্দে লিখেছেন। ছড়াটি চোখ বন্ধ করে পড়লে ভেসে ওঠে সে যুগের পদ্মায় ঝাঁক বেঁধে ইলিশ মাছ চলার দৃশ্য। ভেসে ওঠে জেলেদের মাছ ধরার ছবি। এ যেন কোন চিত্রকর কাগজে তা অংকন করেছেনঃ

ইলশে গুড়ি! ইলশে গুড়ি!
ইলিশ মাছের মড়কি মুড়ি
নদীর বুকে হুড়োহুড়ি
ইলশে গুড়ি! ইলশে গুড়ি!
(ইলশে গুড়িঃ নতুন লেখা।)

১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিল কবির 'ছড়ার আসর' গ্রন্থটি। এতে মোট ১৬টি ছড়া সংকলিত হয়েছে। ছড়াগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কবি লিখেছেন যা সহজে শিশুদের মনকে আকৃষ্ট করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছড়া হলো পেঁচার বাসা, পেঁচাটা কয়, তুই খুলিনা মুই খুলি, খেলার ছন্দ, পেঁচা ও পেঁচালি, হাঁসের গল্প, তুলতে গিয়ে, নাচন নাচন ধূম নাচন প্রভৃতি।

পাঠশালার ছুটির আনন্দ শিশু-কিশোরদের মন ভরিয়ে দেয়।একঘেয়ে ক্লাশের পর আকস্মিক ছুটি হলে শিশুরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে, কবি শিশু-চিত্তের সেই অতি সাধারণ বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন-

পাঠশালাতে ছুটি

হেসেই কুটি কুটি
খুঁজতে গিয়ে রুটি
পেলাম মটরশুটি
রুই কাতলা পুটি
চিংড়ি মাছের কুটি
তাইতো লুটোপুটি
পাঠশালাতে ছুটি
ও ভাই পাঠশালাতে ছুটি ।
(তুলতে গিয়েঃ ছড়ার আসর)

উপরোক্ত ছড়াটি পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' নামক ছড়াটি মনে পড়া স্বাভাবিক–

আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
সকল ছেলে জুটি ।

ফররুখ আহ্মদের মৃত্যুর পর চিড়িয়াখানা, ফুলের জলসা, কিস্সা কাহিনী গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় ।

'চিড়িয়াখানা' গ্রন্থে ৩২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । এতে চিড়িয়াখানায় যে সকল পশু-পাখী ও জলচর প্রাণী থাকে তাদের নিয়ে সুন্দর কবিতা লিখেছেন কবি । কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে চিড়িয়াখানা, কাঠবিড়ালি, হরিণ, বাঘ, ভলুক, অজগর, ঈগল, জলহস্তী, কুমীর ইত্যাদি । যেমন–

দেখতে যাবো কাজের ফাঁকে
প্রাণীর বাসা জগৎটাকে
খোদার গড়া এই দুনিয়ায়
কেউ পানিতে কেউবা ডাঙায়
কেউ ঘোরে শূন্য হাওয়ায়
দেখি আজ চিড়িয়াখানায় ।
(চিড়িয়াথাকাঃ চিড়িয়াখানা ।)
মুর্গী নিয়ে পাতিশিয়াল যায় যে পালিয়ে
চুরি স্বভাব শিয়ালগুলো খায়রে জ্বালিয়ে ।
(শিয়ালের চিড়িয়াখানা ।)

'ফুলের জলসা' ছড়া গ্রন্থে মোট ২৭টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । বাংলাদেশ শিশু একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ডিসেম্বর ১৯৮৫তে । ফররুখ আহমদ ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি । দেশের শহরে-গ্রামে, বনে-বাদাড়ে ফোটে শতশত ফুল । কবি সেসব ফুল নিয়ে ছড়া লিখেছেন । ছড়াগুলির মধ্যে কদম-কেয়া, ফুলের জলসা, শাপলা, গোলাব হাস্নাহেনা, রজনীগন্ধা, চম্পা, সূর্যমুখী ইত্যাদি ।

কবির মৃত্যুর পর কিসসা কাহিনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । গ্রন্থে ৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে এগুলো যথাক্রমে আলী বাবার কিসসা, আলাউদ্দীনের কিসসা ও সাত মঞ্জিলের কাহিনী কবিতা । আরব্য উপন্যাসের গল্প থেকে তিনি কাহিনী গ্রহণ করেছেন ।

তিন. ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর গ্রন্থের সংখ্যা মোট ২৫টি তন্মধ্যে ৪টি কবিতা গ্রন্থ ও ৪টি পাঠ্য স্কুল কাব্য বই তাঁর জীবিত কালে এবং মৃত্যুর পর ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । বাকী ১৪টি গ্রন্থই অপ্রকাশিত রয়েছে ।

কবির জীবনকালে নয়াজামাত নামে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয় । বইগুলো পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কুল পাঠ্য ছিল । এগুলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল ।

কবির অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোকলতা নামের একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে । এতে ২০টি কবিতা সংকলিত হয় । এর মধ্যে আলোকলতা, কোলাব্যাঙ, খাজাভাজা, চানাচুর, ঠাট্টা, শিয়াল পণ্ডিত, মেঘের ছড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 'খুশীর ছড়' গ্রন্থে ৭৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে ।

'পোকামাকড়' নামক আরেকটি গ্রন্থে মোট ২৪টি কবিতা আছে । এতে সাধারণ পোকামাকড় নিয়ে কবিতা লিখেছেন । কবির অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এতে মেলে । আমাদের চারদিকে যে সকল পোকা-মাকড় চলাফেরা করে সেসব তুচ্ছ প্রাণী নিয়েই কবি অসাধারণ কবিতা রচনা করেছেন । যেমন পোকামাকড়, পিঁপড়ে, পিঁপড়ের নেতা, মাকড়সা, মশা, মাছি মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি ।

'মজার ছড়া' গ্রন্থে ১৪টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । কবিতাগুলোর মধ্যে মজার ছড়া, মাছের ছড়া, হানাদার বাহিনীর ছড়া, মীর জাফরের ছড়া, গোলামের ছড়া উল্লেখযোগ্য ।

কবির লেখা অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'পাখীর ছড়া' নামক গ্রন্থে ২৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । কবিতাগুলোর মধ্যে বুলবুলি, মোরগ, হাঁস, কবুতর, টুনটুনি, মাছরাঙ্গা, আবাবিল পাখী, পানকৌড়ি, বক, পেঙ্গুইন উল্লেখযোগ্য ।

'সাঁঝ সকালের কিস্‌সা' নামক একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ কবি পুঁথির কাহিনী নিয়ে গদ্য এবং পদ্যে লিখেছেন। দুষ্ট জ্বিনের কিস্‌সা, হিন্দবাদের কথা, সিন্দাবাদের পয়লা সফর, নৌফেল ও হাতেম তায়ী'র কাহিনী নিয়ে মোট ৭টি কবিতা এতে রয়েছে।

'ছড়াছবি' নামে একটি শিরোনামহীন ছড়া সংকলন রয়েছে। এছাড়া কবির দাদুর কিস্‌সা নামে একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডলিপি পাওয়া যায়।

চার. কবি ফররুখ আহমদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনার যে তালিকা পাওয়া যায় তা বিশাল কলেবরের । শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কবি ছিলেন অতিশয় সচেতন। শিশুদের মন-মানস, চিন্তা-বুদ্ধি-কল্পনা সম্পর্কে কবির অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। যে কবি বিখ্যাত কবিতা পাঞ্জেরী, সিন্দবাদ, সাত সাগরের মাঝি, ডাহুক, লাশ, মুহূর্তের কবিতা প্রভতি অসংখ্য কবিতায় আরবি–ফারসি, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। কখনো বা প্রয়োজনে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই কবিই আবার শিশু-কিশোরদের জন্য যখন লিখেছেন তখন সেগুলো পরিহার করেছেন। সহজ সরল ভাষা, সহজ উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দের ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফররুখ–গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান লিখেছেনঃ "ফররুখ আহমদের শিশুতোষ কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দরাজি বিচার করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, এতে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল শব্দ ব্যবহর করেছেন। যুক্তাক্ষর যুক্ত কোন শব্দ তিনি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। ফলে এসব শব্দের উচ্চারণ পঠন-পাঠন অর্থ অনুধাবন শিশু-কিশোরদের জন্য খুবই সহজ।"

সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ গ্রন্থে ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর কবিতা প্রবন্ধে লিখেছেন–"স্বদেশ প্রেমিক, স্বজাতি প্রেমিক ও মাতৃভাষা প্রেমিক ফররুখ আহমদ চেয়েছিলেন জাতির ভবিষ্যত শিশু-কিশোররা নিজ মাতৃভাষা ভালো করে শিখুক নিজের দেশ, মাটি, মানুষকে জানুক এবং ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হোক। মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবের ইতিহাসের সঙ্গে শিশু–কিশোরদের পরিচয় ঘটুক।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ

সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায়না লেখা সহজে।

ফররুখ আহমদ শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ ভাষা ও ছন্দে সাহিত্য রচনা করেছেন। এ জন্যই তা শিশু-কিশোরদের কাছে এত প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিশুতোষ কবি। অন্যদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্দীন, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, হাবীবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, সানাউলাহ নবী, শামসুর রাহমান, সুকুমার বড়ুয়া প্রমুখ অনেকেই সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত।

কবি ফররুখ আহমদ শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। শিশু- কিশোরদের অনুপ্রেরণার উৎস কবি ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় নিউ ইস্কাটনের বাসায় বিনা চিকিৎসায় অর্থকষ্ট নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অভিমানী আত্মপ্রত্যয়ী আপোষহীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি কারো কাছে নতি স্বীকার করেননি এক আল্লাহ ছাড়া। তাঁর লেখা অসংখ্য শিশু গ্রন্থ এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। এগুলো দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহলে বাংলা সাহিত্য বিশেষত শিশু-কিশোর সাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধ হবে এবং শিশু কিশোররা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

তথ্যপঞ্জিঃ

১. বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল- াহ।
২. ফররুখ প্রতিভাঃ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
৩. পুনর্লেখন ঃ ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১২।
৪. শাহীন শিবির/দৈনিক সংগ্রাম, ১ নভেম্বর, ১৯৭১
৫. সোনালী আসর/২৬শে অক্টোবর, ১৯৯২।

ফররুখ একাডেমী পত্রিকার নিয়মাবলী

* কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বছরে দু'বার সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়।
* ফররুখ-বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ ও ফররুখ আহমদকে নিবেদিত কবিতা সমৃদ্ধ সংকলন।
* মানসম্মত ফররুখ-বিষয়ক যেকোন লেখা সাদরে গৃহীত হয়।
* প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র ২৫ টাকা। ডাক মাশুল ভিন্ন।
* এজেন্টদের জন্য বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।
* লেখার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
  সম্পাদক, ফোন ঃ ৮৮৩৭৫৪০, ০১৮১৯-৪২০৪৮৯
* বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

৬২/১, পুরানা পল্টন (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯।
www.farrukhfoundation.org

হাতেম তা'য়ী

ফররুখ আহমদ

সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংবলিত ফররুখ আহমদের অমর কাব্য

'হাতেম তা'য়ী'র

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা-৩৫২, মূল্য ৩৫০ টাকা মাত্র।

ভষায়ও রাসুল-প্রশস্তিমূলক কবিতা রচিত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন ভাষায় হামদ-নাত লিখে যারা খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের কয়েকজন হলেন : মুহাম্মদ শরফুদ্দীন বুসীরী (১২১২-১২৯৬), ফেরদৌসী (৯৩৫/৩৭/৪১-১০২০), ফরীদুদ্দীন আত্তার (১১১৯-১২২৯), মাওলানা রুমী (১২০৭-১২৭৩), হাফিজ সিরাজী (১৩২৫-১৩৯০), শেখ সাদী (১১৮৪-১২৯১), আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-১৪৯২), আমীর খসরু হেলভী (১২৫৩-১৩২৫), ফৈজী, ইকবাল (১৮৭৫-১৯৩৮) প্রমুখ। মহাকবি গ্যাটেও (১৭৪৯-১৮৩২) নাত রচনা করেছেন জার্মান ভাষায়।

২. বাংলা সাহিত্যে হামদ-নাত ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নাত ধারাটি সমৃদ্ধতর। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে হামদ ও নাত রচিত হতে শুরু করে নিখাদ আন্তরিকতার সঙ্গে। এ যুগে নাত রচনা করেন : সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, শাহ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ মর্তুজা, হায়াত মামুদ, সৈয়দ হামজা, মুনশী জান মোহাম্মদ, শাহ গরীবুলাহ, মোহাম্মদ দানেশ, মোহাম্মদ খাতের, মালে মোহাম্মদ প্রমুখ।

আধুনিক যুগে হামদ ও নাত রচনার ধারাটি বিদ্যমান রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি। নজরুলের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের মধ্যে যাঁরা নাত লিখে খ্যাত হয়েছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উলেখযোগ্য হলেন শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, বে-নজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, কাজী কাদের নেওয়াজ, রওশন ইয়াজদানী, আ. ন. ম বজলুর রশীদ, আজিজুর রহমান, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মাহফুজউলাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবদুল হাই মাশরেকী, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, আল মাহমুদ, আফজাল চৌধুরী, ওমর আলী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মুহম্মদ নুরুল হুদা, সৈয়দ শামসুল হুদা, আবদুল মুকীত চৌধুরী, আসাদ সৌধুরী, রুহুল আমীন খান, সাজজাদ হোসাইন খান, আবদুল হালীম খাঁ, মতিউর রহমান মলিক, মুকুল চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন খান, আবদুল হাই শিকদার, জহুর-উশ শহীদ, মসউদ-উশ শহীদ, হোসেন মাহমুদ, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, রিফাত চৌধুরী, আহমদ মতিউর রহমান, তমিজ উদদীন লোদী, বুলবুল সরওয়ার, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, নুরুল ইসলাম মানিক, সায়ীদ আবু বকর প্রমুখ। সমসাময়িককালে আরো অনেকেই হামদ-নাত রচনা করেছেন। (কৌতূহলী পাঠকের জন্য মুকুল চৌধুরী-সম্পাদিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন-প্রকাশিত 'মহানবী (সা)-কে নিবেদিত কবিতা' সংকলন দ্রষ্টব্য)।

ফররুখ আহমদের হামদ ও নাত

মুহাম্মাদ হাবীবুল- াহ হাস্‌সান

১. 'হামদ' ও 'নাত' আরবি শব্দ। এ দুটি পরিভাষা হিসাবেও গণ্য। পরিভাষা আবার কাব্য-শাখার। হামদ মানে আলাহ-প্রশস্তি, নাত মানে রাসুল-প্রশস্তি। প্রাচীনতম কাব্যের বেশির ভাগই ব্যক্তিবন্দনায় আকীর্ণ। বিশেষ করে রাজ-রাজড়া, উজীর-আমলা ও বীর-যোদ্ধাদের বন্দনা। আবার কিছু-কিছু কাব্যে পাওয়া যায় দেব-দেবীর বন্দনা।

অনুরূপভাবে মুসলিম রচিত সাহিত্যে আলাহ ও রাসুল বন্দনা এসেছে স্বাভাবিকভাবেই। হামদ তথা আলাহ-প্রশস্তির ধারা অবশ্যই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে-যখন থেকে কাব্যসাহিত্য অস্তিত্ব লাভ করেছে পৃথিবীর বুকে। এ ধারায় আলাহবিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করেছে। কারণ, এ মহাবিশ্বমণ্ডল যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বন্দনা সকলেই গাইবেন-সেটাই স্বাভাবিক।

নাত তথা রাসুল-প্রশস্তির ধারাটিও রাসুলের জীবদ্দশায়ই চালু হয়। তবে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের প্রচার-প্রসার ও কাফিরদের প্রতিরোধে খুব বেশি ব্যস্ত থাকায় তাঁর জীবদ্দশায় ধারাটি তেমন বিকাশ লাভ করেনি। রাসুলের জীবনে সর্বপ্রথম নাতকার কাব বিন যুহাইর। তিনি সর্বপ্রথম রাসুলের শানে সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন 'বানত সু'আদ' নামে। আর নবী সা. খুশী হয়ে তাঁর পেছনের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন এবং নিজের ডোরাকাটা মূল্যবান চাদরটি তাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে নিজ হাতে সেটা তাঁর গলায় পরিয়ে দেন। এ স্বর্ণসূত্র ধরে হামদ-নাত আজ সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষ করে আরবি-ফার্সি-উর্দু-বাংলা প্রভৃতি মুসলিম ভাবধারাপুষ্ট ভাষাসমূহে, এক স্বতন্ত্র কাব্যধারার মর্যাদা পেয়েছে। উক্ত ভাষাচতুষ্টয় ছাড়াও ইংরাজি, ফারসি, তুর্কি, জার্মান, লাতিন, হিন্দি ইত্যাদি

উলেখ্য যে, ফররুখের পর এ পর্যন্ত হামদ-নাত কবিতার ক্ষেত্রে একজন কবি ও একটি কবিতা গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আমি মনে করি-এটি তাবৎ বাংলাকাব্যে হামদ-নাতের এক অমর-অনতিক্রম্য গ্রন্থ হিসেবে সগৌরবে বেঁচে থাকবে-সেটি হলো আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩-২০১০) 'সকল প্রশংসা তাঁর'। প্রকাশের (১৯৯৩) মাত্র দু'দশকে গ্রন্থটির বহু সংস্করণ বের হয়েছে এবং গ্রন্থটির ওপর প্রকাশিত হয়েছে প্রায় দশটির মতো স্বতন্ত্র আলোচনা।

৩. ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের একজন মৌলিক প্রতিভাধর শক্তিমান কবি হিসাবে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনা হলেও তাঁর কবিকীর্তির একটি উজ্জ্বল দিক নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। সে উজ্জ্বলতম দিকটি হলো তাঁর হামদ-নাত কাব্য। অন্যান্য সমালোচক ও গবেষকরা তো বটেই, ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকগণও এ-দিকটি নির্মমভাবে এড়িয়ে গেছেন! 'নির্মমভাবে' বলছি এজন্য যে, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউলাহ্‌ রচিত 'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'ফররুখ-চর্চা : সেকালে ও একালে শিরোনামে ফররুখ আহমদকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ ও তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার (এটি অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান প্রণীত ও উক্ত গ্রন্থে সংযোজিত) একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে মৌলিক ও স্বতন্ত্র ১০টি গ্রন্থ, ১৯টি বিশেষ সংখ্যা এবং ৪৮টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের কথা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং লেখক প্রত্যেকটি গ্রন্থ ও পত্রিকার সূচিও লিপিবদ্ধ করেছেন। এতো দীর্ঘ ফিরিস্তিতেও ফররুখের হামদ-নাত কাব্য সম্পর্কে কোনো লেখা দেখা যায়নি। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো, আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো কৃতবিদ্য গবেষক, যিনি আবার ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকদের মধ্যেও অন্যতম, তিনিও ফররুখের হামদ-নাত সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা করেননি। ফররুখকে নিয়ে তাঁর গভীরাশ্রয়ী গবেষণাগ্রন্থ 'ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য'-এ ফররুখের পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন পরিচ্ছেদে 'মাহফিল' গ্রন্থের নামটুকু শুধু উলেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর হামদ-নাত ও তাতে তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কোনো আলোচনাই করেননি। সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত ফররুখকে নিয়ে লেখা গ্রন্থ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও (১২ পৃষ্ঠাব্যাপী) কোথাও এ-বিষয়ে কোনো রচনার সাক্ষাৎ মেলে না। এমনকি, ফররুখ একাডেমী পত্রিকার একুশটি সংকলনেও এ বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দেখা যায় নি। কোনো কোনো প্রবন্ধে আংশিকভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর ইসলামি গান-গজলের কথা এসেছে মাত্র। তবে কিছুদিন আগে মুকুল চৌধুরী 'ফররুখ আহমদের ইসলামি গান-গজল' নামে মাহফিল গ্রন্থের একটি আলোচনা লেখেন, সেটাও হামদ-নাত নিয়ে, স্বতন্ত্র-

মৌলিক কোনো আলোচনা নয়। তাই বলা যায়, ফররুখ আহমদের কবিকীর্তির এ একটি উপেক্ষিত ও অবহেলিত দিক।

কেন-কিভাবে এ দিকটি অনালোচিত থেকে গেছে, তার প্রকৃত কারণ ও রহস্য ডুবুরি গবেষকরাই বেশি বলতে পারবেন। ফররুখের হামদ-নাত নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা না হওয়ার একটি কারণ হতে পারে সংখ্যাল্পতা। তাঁর হামদ-নাত কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। 'মাহফিল' কাব্যগ্রন্থে মাত্র একত্রিশটি হামদ ও বারোটি নাত সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া, তাঁর হামদ-নাতসহ অন্যান্য ইসলামি গান-গজল গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে কবির মৃত্যুর তেরো বছর পর। এমনকি, তাঁর হামদ-নাতধর্মী বহু কবিতা ও গান এখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে, বেতারকেন্দ্রের আর্কাইভে। এসব কারণ সাধারণ সমালোচক ও গবেষকদের বেলায় হয়তো প্রযোজ্য, কিন্তু সিরিয়াস সমালোচক ও গবেষকদের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। সংখ্যাসল্পতা কোনো কারণই হতে পারে না। কারণ, শিল্পসফলতা সংখ্যাধিক্যে নয়, শিল্পের নৈপুণ্য, সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে। ফররুখ আহমদের অন্যান্য কবিতার মতো হামদ-নাতও স্বমহিমায় ও সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে কবিতার বহুকৌণিক গুণে ও মানে : কাব্যগুণে, শিল্পনৈপুণ্যে, শব্দের কুশলী ব্যবহারে, ছন্দের মোহিনী মায়ায়, রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের চাতুর্যে, সর্বজনপাঠ্যতায় ও আবৃত্তিযোগ্যতায়। তাঁর হামদ থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলোঃ

আসমান আর জমিনে যা আছে সকলি প্রভু তোমার
ধূলিতল থেকে দূর নীহারিকা, গ্রহ, তারা বেশুমার।
পুষ্পিত বন, গহীন কানন লতা পলব দল
পৃথ্বি ললাট-ধূ ধূ মরু মাঠ, সমুদ্র উচ্ছল
নিপুণ আর প্রাণবন্ত যে সৃষ্টির সম্ভার।
অনুকণা থেকে বিপুল বিশ্ব-ক্ষুদ্র, বৃহৎ যত
সৃষ্টি তোমার নির্দেশে তব আছে প্রভু অনুগত
অদৃষ্ট বা দৃষ্টিগোচর রওশন 'নূর' 'নার'।
(হামদ : দুই, মাহফিল, পৃ.১)
মুখর অথবা মৌন সকলে প্রশংসা গাহে তব
প্রাচীন বনানী অথবা সবুজ তৃণদল অভিনব
ঝর্ণার ধারা, সাগর, সাহারা-প্রসারিত বিয়াবান।
অঝোর বর্ষা বারি-বর্ষণে তব বন্দনা গায়,
অতল গভীর সুর ওঠে জেগে প্রশান্ত দরিয়ায়,
তারার মিছিলে তোমার তারিফ গাহে যে সারা জাহান।

(হামদ : তিন, মাহফিল, পৃ.২)

৪. ফররুখ আহমদের হামদ-নাত মূলত সংকলিত হয়েছে 'মাহফিল' গ্রন্থে যা প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর তেরো বছর পর ১৯৮৭-এ। প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। গ্রন্থে কবি হামদ ও নাত বলে চিহ্নিত করেছেন কিছু-কিছু কবিতাকে। হামদ নামে চিহ্নিত করেছেন ৩১টি এবং নাত নামে চিহ্নিত করেছেন ১২টি। মোট ৪৩টি কবিতা। এছাড়া, হামদ-নাত নামে উল্লেখ না করলেও উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আরো কিছু হামদ-নাত পাওয়া যায়। হামদ যেমন: 'তাসমিয়া', 'আল কুরআন', 'হে মালেকু মুল্ক', 'ভয় কর তুই আলাহ্‌কে', 'যার অন্তরে ভাই আছে শুধু', 'আলাহ্‌ ছাড়া কারুর কাছে' ইত্যাদি। নাত যেমন: 'রবিউল আউয়াল' ১-৩, 'ঈদে মিলাদুন্নবী' ১-২, 'সে এলো, সে এলো', 'নবী মুহাম্মদ (স.)' ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থে কবি খৈয়াম, সাদী ও জামীর কিছু নাতও অনুবাদ করেছেন।

উলেখ্য যে, হামদ মানে শুধুই প্রশংসা বর্ণনা করা নয়। হামদের আরো ব্যাপক অর্থও রয়েছে। দোয়া, মোনাজাত, আলাহ্‌র সঙ্গে মিলনের আকুতি, দেশ-ধর্ম-জাতির সংকট মুহূর্তের সদরদ বর্ণনা ইত্যাদিও হামদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেন কেউ কেউ। সে হিসাবে ফররুখের হামদ সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায়। কারণ, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দোওয়া ও মোনাজাত নামে ৩৫টি কবিতা রয়েছে। তেমনিভাবে নাতের পরিধিও সুবিস্তৃত। রাসুলের জীবনী, তাঁর চরিত্রের বর্ণনা, মদীনা থেকে দূরে অবস্থানের জন্য দুঃখ প্রকাশ, অপরাধের জন্য অনুশোচনা, সুপারিশ প্রার্থনা, রাসুলের কৃতিত্ব ও অবদানের আলোচনা, দরুদ-সালামের আলোচনা ইত্যাকার বিষয়ও নাতের অন্তর্ভুক্ত।

হামদ-নাতের উক্ত ব্যাপক অর্থ ধরলে ফররুখ আহমদের হামদ-নাত সংখ্যায় আর অল্প থাকে না। তখন 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২) ও 'কাফেলার' (১৯৮০) অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো কবিতাকে হামদ -নাত বলে বিবেচনা করা যায়। বিশেষ করে সিরাজাম মুনীরা-কে তো পুরোপুরিই নাত বলা যায়। কোনো কবিতাকে বা কবিতাগ্রন্থকে হামদ বা নাতের অন্তর্ভুক্ত বললে তাতে সে সৃষ্টির জাত ও মান যায় না, বরং বাড়ে। মান যায় বলে যা আজ মনে করা হচ্ছে, সে ধারণা মূলত সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদী মন-মানসিকতারই বিষফসল। আসল দেখার বিষয়টা হলো কবিতাটি যথার্থ কবিতা হয়েছে কিনা। বিষয়, ধর্ম-নীতিকথা-হামদ-নাত, যাইহোক কবিতাকে প্রকৃত কবিতা করে তুলতে পারার কারণেই তো আজ খৈয়াম, হাফিজ, রুমী, সাদী, জামী ও ইকবাল অমর বিশ্বকবি হিসেবে শিরোপা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাই ফররুখের সিরাজাম মুনীরাকে নাতকবিতা বললে তার মানকে ম্লান করা হয় না।

৫. ফররুখের হামদ-নাত এবং অন্যান্য ইসলামি গান ও গজলের বক্তব্য- কোথাও বা পুরোপুরি কোথাও বা আংশিকভাবে- কুরআন ও হাদিসভিত্তিক। তাঁর লেখা হামদ-নাতের পরতে পরতে ছড়ানো রয়েছে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যের নির্যাস। রয়েছে কোথাও বা শাব্দিক অনুবাদের মতো, আবার কোথাও বা ভাবার্থে বা বিশেষণমূলকভাবে। যেখানে তিনি কোনো আয়াত বা হাদিসের সরাসরি তর্জমা করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি ব্রাকেটে তা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন,

হামদ : ষোল

(সুরা ত্বীনের ভাবানুসরণে)
গড়েছ মানুষ সেরা উপাদানে/রাববুল আলামীন
পরিবর্তনে করেছ তাকেই/আসফালা সাফেলীন।
তার বিশ্বাস, তার আচরণ/হয় কলুষিত, ক্লিণ্ন যখন
পাশবিকতার নিম্নে সে নামে/ক্লেদাক্ত, ধূলি-লীন।
মানুষ তখন অধম সবার/বিশ্বে মেলে না তুলনা যে তার
নিকৃষ্ট এ সৃষ্ট জগতে/জানি সবচেয়ে দীন।
নীচ কর্মের এই পরিণতি/তোমার বিচারে পায় দুর্গতি
বিশ্বাসী যারা করে সৎ কাজ/ফল পায় অমলিন।
দেয় তোমার বিচারে অপবাদ যারা/মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্ট যে তারা
অপক্ষপাত তোমার বিচার/জানি যে তুলনাহীন।

এ হামদটি কুরআন করীমের ৯৫নং সুরা ত্বীনের ভাবানুসারে রচিত। এভাবে তাঁর 'মাহফিল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একত্রিশটি হামদের মধ্যে তিনটি হামদ কুরআনের ভাবানুবাদস্বরূপ রচিত। যেমন হামদ : এক সূরা ফাতেহার ভাবানুসারে রচিত, হামদ: ষোল সুরা ত্বীনের ভাবানুসারে রচিত এবং হামদ : চবিবশ আয়াতুল কুরসীর ভাবানুসারে রচিত। এছাড়াও উক্ত কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ইসলামি গানে কুরআন করীমের ১০৭ নং সুরা মাউনের ভাবানুসারে রচিত একটি গজল এবং সুরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতের ভাবানুসরণে রচিত একটি মোনাজাত রয়েছে। এসব হচ্ছে যেখানে কবি নিজেই ভাবানুসরণে তর্জমা বলে চিহ্নিত করেছেন। কবির চিহ্নিত হামদ-নাত ছাড়াও আরো বহু হামদ-নাতে সরাসরি কুরআনের কোনো আয়াতের অনুবাদ বা কোনো প্রসিদ্ধ হাদিসের অনুবাদ পাওয়া যায়। উদাহরণ এন্তার রয়েছে। শুধু একটি হামদ দেখা যাক,

হামদ : কুড়ি

হে মালেকুল-মুলক-প্রভু!/কুল আলেমের সম্রাট মহান/
তোমার বিপুল বিশ্ব থেকে/ইচ্ছামত রাজ্য করো দান।

মালিক যখন ইচ্ছা তোমার/নাও, কেড়ে সে রাজ্য আবার/
ইচ্ছামত দাও সম্মান/ইচ্ছামত দাও অপমান/
ইচ্ছামত দাও তুমি কল্যাণ/সুনিশ্চিত সবার পরে/
প্রভু তুমি সর্বশক্তিমান ।
দিনকে মেলাও রাতের মাঝে/রাতকে মিশাও দিনের মাঝে/
জীবন থেকে আনো মরণ/মরণ থেকে আনো জীবন/
তোমার মহান ইচ্ছামত/দাও জীবিকা;- রিজিক অফুরান ।

উক্ত হামদটিতে কুরআন করীমের ৩নং সুরা (আল ইমরান)-এর ২৫-২৬ নং আয়াতের মূল বক্তব্যটাই প্রতিলিপিত হয়েছে । তবে আয়াতদ্বয়ের সরাসরি অনুবাদ নয় । সরাসরি অনুবাদ না হওয়াটা ভালোই হয়েছে । কারণ, আরবি ভাষা, উপরন্তু 'না গদ্য না কবিতা'র মতো কুরআনী ভাষাকে বাংলা করার যে অনতিক্রম্য জটিলতা, তা থেকে সহজে উত্তরণ হয়েছে । ফলে এসব হামদের বয়ন ও বুনন কবির স্বরচিত কবিতার মতোই সুস্থ, গতিময় ও টসটসে প্রাণবান হয়েছে । এখানেই ফররুখ আহমদের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিহিত ।

ফররুখের হামদকবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 'আসমাউল হুসনা' তথা কুরআনে বর্ণিত আলাহ্র গুণবাচক নিরানব্বইটি নাম কবিতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন- ভাবানুবাদের মাধ্যমে । এমনকি তিনি ৪৬টি নাম সরাসরি আরবিকে বাংলায় প্রতিবর্ণিকরণ করে ব্যবহার করেছেন । যেমন, 'রাববুন', 'নূর', 'আলেম' (আলিমুন), 'ইলাহ', 'যুলজালালি ওয়াল ইকরাম', 'মালিক', 'আউয়াল', 'আখের', 'ওয়াহেদ', 'আহাদ', 'লতিফু', 'খবীর', 'খালিকু', 'বারি', 'মুসাব্বির', 'হাইয়ু', 'কাইয়ুমু', 'হাদী', 'মুনয়িমু', 'মুনতাকিম', 'মুয়িজ্জু', 'মুযিলু-', 'জববার', 'কহ্হার', 'কাদির', 'মুকতাদির', 'সামীয়ু', 'বাসীর', 'রাজ্জাক', 'মতীন', 'গাফফার', 'গফুর', 'সাত্তার', 'সবুর', 'আলিয়ু', 'আজিম', 'মাবুদ', 'মাকসুদ', 'মাওলা', 'ওয়ালি', 'ওয়াদুদ', 'জাহের', 'বাতেন', 'হাজের', 'নাজের' 'মওজুদ', ইত্যাদি ।

যে পঙক্তিতে তিনি আলাহ্র গুণবাচক আরবি নাম, যার অর্থ তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন, ব্যবহার করেছেন, সে পঙক্তির আগে বা পরে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা করে দিয়েছে আশ্চর্য এক কুশলী ভাষায় । কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক–

আলাহ 'হাদী' কর তুমি সুপথ প্রদর্শন
হিদায়াতের আলোকে দিল কর যে রওশন ।
হে 'মুয়িজ্জুল মুযিলু-হক মাওলা মহিয়ান
বান্দাকে দাও সম্মান আর দাও যে অসম্মান ।
সর্বশক্তিমান হে মহান মালিক বিশ্ব ধরিত্রীর
সবার পরে শক্তি হে 'কাদিরুল মুকতাদির' ।
হে 'সামীয়ুল-বাসীর''- প্রভু শোন তুমি সকল কথা

সকল কিছু দেখো তুমি, রাখো তুমি সব মতা ।
তুমি 'আলিয়ুল আজিম' হে প্রভু! মহিমা যে অতুলন,
তব উন্নত মহিমা যে অতুলন ।

কিছু কিছু কবিতায় আলাহ্র নামসমূহের কুশলী ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো । পঙক্তির শেষ শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন আরবি নামগুলো । তাতে পূর্বাপরের ছন্দমিল ও অন্ত্যমিলের এক মনমাতানো সুরতাল সৃষ্টি হয়েছে । আর এখানেই ফররুখের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য সবিশেষ চিহ্নিত হওয়ার মতো । যেমন–

তোমাদের দেওয়া রূপ আলোকে ফুলের হাসি, রোশনি, রবির
জ্যোতিষ্কদের আলোর মিছিল;-'ইয়া লতিফুল খবীর ।'
সর্বশক্তিমান হে মহান মালিক বিশ্ব ধরিত্রীর
সবার পরে শক্তি হে 'কাদিরুল মুকতাদির' ।
অটল হে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন
তুমি রাজ্জাক, তুমি মতীন ।
পায় সান্ত্বনা, শান্তি-নূর
তুমি গাফফার, তুমি গফুর ।
পায় নবরূপ পাহাড় তুর
তুমি সাত্তার, তুমি সবুর ।

তাঁর নাতকবিতার ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বক্তব্যগুলো প্রযোজ্য । সেখানেও কবি রাসুলের গুণাবলি, রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমনিবেদন কুরআন-হাদিসসম্মত পদ্ধতিতে করেছেন । কুরআন-হাদিসের আলোকে রাসুলের যেসব গুণ সর্বাগ্রে উলেখ্য, কবি সেগুলোর কথাই বেশি আলোচনা করেছেন । যেমন, কালিমা তাইয়িবার শেষাংশ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ্', কালিমায়ে শাহাদতে বর্ণিত, 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু', কুরআনবর্ণিত 'উসওয়াতুল হাসান', 'রাহমাতুলিল আলামীন', 'খাতামুন নবীয়ীন', বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত 'শাফিউল মুজনাবিন, 'সাইয়েদুল মুরসালীন', ইত্যাদি । এমনকি কোনো কোনো কবিতায় কবি কুরআনের এক টুকরো আয়াত এবং উত্তরসূরী কোনো কবির কিংবদন্তীতুল্য কোনো পঙক্তিও জুড়ে দিয়েছেন নিজের কবিতার সঙ্গে । যেমন,

তোমায় জেনে অর্থ বুঝি, ''অ-রাফায়ানা-লাকা-জিকরাক''
পাও যে আসন উর্ধ্বে সবার- রাহমাতুলিল আলামীন ।
'জাহাঁ রওশনাস্ত আজ জামালে মুহাম্মদ'
হে অপরূপ সৃষ্টি খোদার
জাহান তোমার জামালে রওশন
খোদার রহম বিলিয়ে দিতে

ধূলির ধরায় তোমার আগমন।

প্রথমোক্ত কবিতায় কুরআনের ৯৪ নং সূরার ৪ নং আয়াতটি হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ : 'আমি তোমার মর্যাদা উঁচু করে দিয়েছি।' দ্বিতীয় কবিতায় একজন ফারসি কবির একটি ফারসি পঙক্তি সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে। মহৎ ও উন্নত কবিতার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ধৃতি দোষের কিছু নয়, বরং সম্মানের। প্রায় সব মহৎ কবির কবিতায় এ ধরনের উদ্ধৃতি আছে, অন্য বড় কবির কোনো পঙতির অনুবাদ আছে, আছে অন্যভাষার বিখ্যাত কবির কবিতার ভাবানুবাদ।

হামদ-নাতে কবির শব্দচয়নও ঐতিহ্যানুসারী-তাঁর অন্যান্য কবিতার মতো। ফররুখের পূর্বে আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে অনেক কবি আরবি-ফারসি শব্দ সংযোজন করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও তাতে নতুন রূপ সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু নজরুল ছাড়া বিষয় ও ভাবের সঙ্গে ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত গতি ও সঠিক সঙ্গতি রক্ষা করতে কেউ সক্ষম হননি। নজরুলের পরে ফররুখ আহমদই আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের আশ্চর্য কুশলী ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মানসের সুপরিচিত সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁর এ দক্ষতা কবিতায় যেমন, তেমনি তাঁর হামদ-নাত ও অন্যান্য ইসলামি গানেও আশ্চর্য এক শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফররুখ আহমদের হামদ-নাতধর্মী কবিতা ও গানসমূহ গভীরভাবে পাঠ করে গবেষকরা তাঁর শক্তি, স্বাতন্ত্র্য এবং পুরো বাংলা কাব্যে তাঁর প্রভাবের কথা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। আমি শুধু বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত করলাম। এক্ষেত্রে ফররুখের অনুরাগী সমঝদার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই

১.	বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস	নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান
২.	বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে	ড. আসকার ইবনে শাইখ
৩.	নতুন জমিনদার	শাহেদ আলী
৪.	কাবিলের বোন	আল মাহমুদ
৫.	ঈমানদার	শফীউদ্দীন সরদার
৬.	বহুরূপে নজরুল	শাহাবুদ্দীন আহমদ
৭.	কবি ফররুখ ঃ তাঁর মানস ও মনীষা	শাহাবুদ্দীন আহমদ
৮.	ফররুখ প্রতিভা	মুহম্মদ মতিউর রহমান
৯.	বাংলা সাহিত্যের ধারা	ঐ
১০.	বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন	ঐ
১১.	রবীন্দ্রনাথ	ঐ
১২.	স্মৃতির সৈকতে	ঐ
১৩.	সাহিত্যচিন্তা	ঐ
১৪.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম	ঐ
১৫.	হাজার বছরের বাংলা কবিতা	ঐ

'পাঞ্জেরী' কবিতায় ক্রান্তিকালের মুসলিম সমাজ

শাহ সিদ্‌দিক

বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদের একটি বিখ্যাত কবিতা পাঞ্জেরী। এটি একটি রূপক কবিতা। সাধারণভাবে এর যে অর্থ, এর অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে থেকে ভিন্ন। কবিতাটি পাঠ করার সময় ঐ আপাত অর্থের আড়ালে নিহিত রহস্যময় চিত্রকল্প পাঠক মনকে আন্দোলিত করে। ভাবসম্পদের গভীরে অব্যাহতভাবে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। পাঠক মন তাই বারংবার সেই গভীরে আবহন করতে বাধ্য হয় এবং অন্তর্নিহিত ভাবের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়।

'পাঞ্জেরী' একটি ফারসি শব্দ। বিশিষ্ট সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষায় এ শব্দটি ফররুখের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। পাঞ্জেগানা শব্দটিও ফারসি থেকে এসেছে। উচ্চারণগত দিক থেকে একজাতীয় শব্দই মনে হয়। কিন্তু দুটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। পাঞ্জেগানা বলতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বুঝায়, পক্ষান্তরে 'পাঞ্জেরী'র অর্থ কিস্তি নৌকা কিংবা জাহাজের মাস্তুলে পথ-প্রদর্শক আলোক-বর্তিকা। আর কবি যখন একেই জিজ্ঞাসা করেন 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী' তখন রহস্য জট পাকাতে শুরু করে। পাঞ্জেরী অর্থ জাহাজের নাবিক কিংবা কাণ্ডারী নয়-অথচ তার কাছে রাতের খবর জানতে চাওয়ায় রহস্যের সূত্রপাত ঘটেছে। রহস্য ঘণীভূত হয় যখন কবি বলেন–

"এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে আমি দাড় টানি ভুলে
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি"

প্রথমেই একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, পথ দেখানোর কাজটা তো 'পাঞ্জেরী' করছে তাহলে সেতারা হেলাল অর্থাৎ তারকা কিংবা চাঁদের খবর নিতে কেন হচ্ছে। তাছাড়া, পাঞ্জেরীর দেখানো পথে দাড় না টেনে কেন ভুল পথে টানা হচ্ছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতাটি এরকম অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে। সেজন্য পাঠকমন একটি রহস্যের বেড়াজালে ঘুরপাক খায়। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়, এ কবিতাটি ভ্রমন একটি চিত্রকল্প হাজির করছে যা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সংকুল রাতে সমুদ্রগামী একটি জাহাজের গতি-প্রকৃতি ও অবস্থা বর্ণনা করছে। কিন্তু এখানে ভাবের যে ঘনবদ্ধতা সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তাকে কোনো ভাবেই একটি জাহাজের স্বাভাবিক বর্ণনা মনে করা যায় না। বরং মনে হয় এর প্রতিটি শব্দ প্রতিটি পংক্তি অন্য কোনো কথা বলতে চাইছে। অন্য কোনো নিগূঢ় অর্থ ব্যক্ত করতে চাচ্ছে। বিশেষ করে যখন দেখা যায় কবির মানস-প্রবণতা বাস্তবতা মনস্ক এবং বিনির্মিত চিত্রকল্পটি সমকালের ঐতিহাসিক সমাজবাস্তবতার সন্দে সুসমঞ্জস্যতাপূর্ণ তখন এর বিশেষত্বটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরের স্তবকে ঐ একই ভাবের ব্যঞ্জনা অনুরণিত হতে দেখা যায়। সেখানে কবি বলেছেন–

"দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন দুরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?
একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব
অস্ফূট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী।"

এখানে সমুদ্র যাত্রায় হতাশা আর অসহায়ত্ব যেন দানা বেঁধে উঠেছে। যাত্রা পথে নানা শংকা মাথা তুলেছে। এর পরের স্তবকে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে এ সফরের সঙ্গে তীরের মানুষ তথা সমাজ সংসারের অন্যদেরও একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাদের কথা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে-

"বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোণে
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় জাহাজের ধ্বনি শোনে;
বুঝি কুয়াশায়,জোছনা মায়ায় জাহাজের পাল দেখে
আহা পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তকদিরে
নিরাশার ছবি এঁকে।

জাহাজের জন্য তীরের মানুষ দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। তারা মৌসুমী হাওয়ায় জাহাজের শব্দ অনুভবই শুধু করছেনা কুয়াশা দেখে অনুমান করেছে ঐ যেন জাহাজের পাল দৃষ্টিগোচর হল। এর পরের স্তবকে নাবিকদের আগমন পথের নৈরাশ্য আবারো প্রকট হয়ে পাঁজরে বেজে ওঠে। পরবর্তী স্তবকটিতে ব্যক্ত হয়েছে নাবিকদের আত্ম-সমালোচনা। এ দীঘল রাতের ক্লান্ত সফর

হাতাশায় নিমজ্জিত হবার পেছনে নিজদের দায় যে উপেক্ষণীয় নয়, সে কথাই বিবৃত হয়েছে এভাবে–

"শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া-অথৈ ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে
আমাদের ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা শশী
মোদের খেলায় ধূলায় লাটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দূর্ভাগ্যের বিঃস্বাদ শর্বরী"

জাহাজের চালক অর্থাৎ অভিযাত্রীদল তাদের দায়িত্বকে যাথার্থ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছে। খেয়ালের ভুলে সীমাহীন ভ্রান্তি কাঁধে তুলে নিয়েছে। জাহাজের পানে চেয়ে থাকা তীরের জনতা দেখেছে তাদের চোখের সামনে থেকে আশার আলো নিভে যাচ্ছে। অভিযাত্রী দলের মিশন ছিল তাদেরকে জাহাজে তুলে নেয়ার কিন্তু তারা হেলাখেলায় সমগ্র অভিযানকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাদের অবহেলায় এবং খেয়ালী খেলার তীরের মানুষের দূর্ভাগ্যের রাত দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাদের আশার স্বপন ধূলায় লুটায়ে পড়েছে।

মোটামুটি এটাই হল পাঞ্জেরীর কাহিনী চিত্র। এরকম একটি চিত্রকল্প সেটি যখন বাস্তবের সঙ্গে পরতে পরতে মিলে যায় তখন তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। সত্যি বলতে কবির এ চিত্রকল্পটি যে সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি ছিল তা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। এ ক্ষেত্রে পাঞ্জেরীর রচনাকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটি ফররুখের বিখ্যাত 'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতা। এ গ্রন্থের তিনটি কবিতার রচনাকাল জানা যায়নি যার একটি এই 'পাঞ্জেরী'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে এবং এর কবিতাগুলি ১৯৪৩-৪৪ সময়ে রচিত। সেজন্যে ধরে নেয়া হয় ১৯৪৩ থেকে ৪৪ পর্যন্ত দু'বছর সময়ের মধ্যে 'পাঞ্জেরী' রচিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়টি রাজনৈতিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান তথা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্ন তখন বাংলার নিপীড়িত কোটি জনতার মনে-প্রাণে সুতীব্র উচ্ছ্বাসে বিরাজিত। জগৎ জুড়ে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হানাহানি। যুদ্ধের একটি পক্ষ উপমাহাদেশের দখলদার ব্রিটিশ বেনিয়া। যুদ্ধ শেষ হলে তারা ভারত ছেড়ে যাবে-এমন একটি আশার বাণী এদশেবাসীকে আন্দোলিত করে। তাদের অপশাসনে এদেশের জনজীবনে অমানিশার ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছিল। ১৯০ বছরের এ অন্ধকার অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল ১৭৫৭ সালে পালাশি যুদ্ধের প্রহসনের মাধ্যমে। যুদ্ধ করে নয় ষড়যন্ত্র করে তারা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে

এবং তার ফলে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়। সেই থেকে ১৯৪৭ সালে বেনিয়ার দল ভারত ত্যাগের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টা তাই অন্ধকার যুগ। কবি একেই অন্ধৎকার রাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ অন্ধকার রাতের অবসান হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৪৪ সাল সময়টি তাই দীর্ঘ অমানিশার সুবহে সাদিকের মতো। সুবহে সাদিক হল রাত ও দিনের সন্ধিক্ষণ সেটা যেমন পুরোপুরি রাত নয় আবার দিনও নয়। সেজন্য অবশ্য দিনের আকাংক্ষায় অতিশয় উদ্বেলিত হওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়ার সংগত কারণও ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সেই যে প্রথম সুবহে সাদিক পরিদৃশ্যমান হল তা যে আকস্মিক গুপ্তধন পাওয়ার ঘটনা ছিলনা সে কথা বলাই বাহুল্য। এ সময়টি অর্জন করতে হয়েছিল। মুসলমানরা পলাশিতে সব হারানোর পর ১৮৫৭ সালে আবার সবকিছু উদ্ধারের সর্বাত্মক সংগ্রাম করে ব্যর্থ হল। এর পরের ইতিহাস মুসলমানের জন্য উভয় সংকটের ইতিহাস। একদিকে বৃটিশ শাসনোত্তর যুগের সম্ভাবনা প্রবল হচ্ছে অন্যদিকে ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য গো ধরল কংগ্রেস নেতারা। এতে অবশ্য অসুবিধার কারণ ছিলনা যদি কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে সক্ষম হতেন। বস্তুত পক্ষে তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এরকম একটা প্রেক্ষাপটে ১৯১৬ সালে লাক্ষ্ণৌচুক্তি ভণ্ডুল হয়ে গেলে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ রাজনীতি ছেড়ে দেন। পরে ব্যারিস্টার আমির আলীর একান্ত অনুরোধে রাজনীতিতে প্রত্যাবর্বন করে তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেসের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের যুপকাষ্ঠ থেকে মুসলমানদের বের করে আনেন দ্বিজাতিতত্ত্বের মন্ত্র পড়িয়ে। স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা করতেই লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে এ স্বাধীন আবাস ভূমির দাবি উত্থাপন করা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন বাংলার নয়নমণি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। বাংলার মানুষ এতে দারুণ সন্তুষ্ট ছিলেন, আশাবাদী ছিলেন দারুণভাবে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে একটি বড় ধরনের অনর্থ ঘটে যায়।

ফজলুল হক মুসলিম লীগের নেতা হিসাবেই মূলত তখনকার অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে কি নিয়ে মত বিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রী সভার মুসলিম লীগ সদস্যরা এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পদত্যাগ করেন। ফলে তাঁর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায়। অবশ্য শীঘ্রই তিনি আবারো মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ পান এবং দ্বিতীয় বার সরকার গঠনে তিনি কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও কৃষক প্রজা

পার্টিকে সরকারের শরিক করে নেন। এ জোট সরকারে হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীত্ব লাভ করায় মুসলিম লীগপন্থী মহল ভীষণ সন্তুষ্ট হয়। ব্যাপারটা মুসলিম মহলে কতটা বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল তা দুয়কটি ঘটনার উল্লেখে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফজলুল হকের অর্থায়নে পরিচালিত 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ তার 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর'- এ লিখেছেন-

"তিনি (শেরে বাংলা) সর্বপ্রথম আমাকে জানান যে, শুধু কৃষক-প্রজা ও কংগ্রেসের সাথেই তিনি আপোষ করিতেছেন না। হিন্দু মহাসভা নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সাথেও তার আপোষ হইতেছে। ডাঃ শ্রামাপ্রসাদকেও তিনি তাঁর নয়ামন্ত্রী সভায় নিতেছেন। আমি শুধু আকাশ হইতে পরিলাম না আস্ত আসমানটাই আমার মাথায় পড়িল। আমি জানিতাম হক সাহেব সময় সময় খুবই বেপরোয়া হইতে পারেন। কিন্তু এতটা হইতে পারেন, এতকাল তাঁর শাগরেদি করিয়াও আমি তা জানিতাম ন। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে, সে ভাব কাটিতে বোধ হয় আমার পুরো মিনিট খানিকই লাগিয়াছিল।"

আবুল মনসুর আহমদের মানোভাবের এই যে খবর এখানে পরিবেশিত হল তা যে একান্তই তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা সমাজের মানবিক অবস্থার চিত্রকল্প। শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় মুসলিম লীগে যোগ দেন। একদল ছাত্রনেতা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে তার সঙ্গে দেখা করেন। মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত বিখ্যাত 'আজাদ' পত্রিকাতো তার বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ সম্পর্কে আজাদের বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাদ্দের তাঁর বিখ্যাত 'সাংবাদিকের রোজনমচা' গ্রন্থে লিখেছেন–

"মওলানা (আকরম খাঁ) সাহেব 'আজাদের' সম্পাদক মণ্ডলীকে কলমে শান দিয়ে সংগ্রামে নেমে পড়ার নির্দেশ দিলেন। মওলানা আকরম খাঁ স্বয়ং সম্পাদকীয় লিখলেন 'কাফেলা বলিল'। সংবাদ বিভাগে আমি প্রচারণার নতুন পথ ধরলাম। প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা কিংবা কৃষক-প্রজা কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা না বলে এই মন্ত্রী সভার নাম দিলাম 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা। যদিও এই মন্ত্রীসভায় হিন্দু মহাসভার মাত্র দুজন শ্যামপ্রসাদ ও তাঁর ভগ্নিপতি প্রথম ব্যানির্জ ছিলেন, তবুও শ্যামা প্রসাদকে সামনে টেনে আনার মতলব আর কিছু নয়-হক সাহেবের জনপ্রিয়তা হ্রাস করার পথ সহজ করা।"

হক সাহেবের জনপ্রিয়তা নষ্টের জন্যে বাংলা মুসলিম ছাত্ররাও আন্দোলনে নেমে পড়ে। মুসলিম লীগ ও ছাত্রনেতারা দিকে দিকে হক বিরোধী প্রচারভিযানে নামলে হক সাহেব দিশেহারা হয়ে দমননীতির আশ্রয় নেন। শেষমেশ ১৯৪৩ সালে "শ্যামা-হক' সরকারের পতন হয়। এ সময়টায় মুসলমানদের মধ্যে

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নিদারুণ হতাশা নেমে আসে। কার্যত এটা একটা স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পথকে ধোয়চ্ছন্ন করে দেয়। ফজলুল হক নিজেও বিষয়টি যথাসময়ে অনুধাবন করেন এবং পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করে মুসলমানদের মূল স্রোতে ফিরে আসেন।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাস ভূমির স্বপ্নে নিমগ্ন কবি ফররুখ আহমদের মনে বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের এধরনের রাজনৈতিক চালবাজিকে সুনজরে দেখতে পারেননি। নেতৃত্বের ভুলের কারণে স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্ন ধূলায় লুটাতে বসার অবস্থাকে তাই তিনি ভুলের খেলা হিসাবে চিত্রিত করেছেন। এ পর্যায়ে এসে বলতে পারা যায় সমগ্র 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি পাকিস্তান তথা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আভিযানকে চিত্রিত করেছে। এখানে আসমান ভরা মেঘের আড়ালে বাংলার জনসমাজকে বুঝানো হয়েছে। অসীম কুয়াশার আড়ালে রাজনীতির কালো অধ্যায়কে বুঝানো হয়েছে। তুমি মাস্তুলে, আমি দাড় টানি ভুলে বলে বুঝিয়েছেন নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝিকে।

সওদাগর বলতে স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের প্রতি আঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে, জাহাজ বলতে অভিযাত্রীদলকে বুঝানো হয়েছে, বন্দর বলতে স্বাধীনতার সুবর্ণদ্বীপকে বুঝানো হয়েছে এবং মুসাফির দল বলতে বাংলার মানুষকে বুঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে চিত্রকল্পটি হল একটি স্বাধীন আবাসভূমি-বন্দরের পথে জাহাজরূপ একটি অভিযাত্রী দল সংগ্রাম দুস্তর পথ পাড়ি দিচ্ছে। পথে পদে পদে কুয়াশারূপ বাধা-বিপত্তি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। আর তা অতিক্রম করতে অভিযাত্রীদলের নেতাদের ভুলত্রুটি খেয়ালীপনায় সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা খাবি খাচ্ছে। ফলে অভিযানের সাফল্য বিলম্বিত হচ্ছে এবং বন্দররূপ কাঙ্ক্ষিত আবাসভূমির মুসাফিরবা যাত্রীরূপ জনসমাজ স্বপ্ন-ভঙ্গের আশংকায় ব্যথাহত হৃদয়ে গভীর প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করছেন। অনিশ্চয়তার এ ঘোর অমানিশার অবসান কখন হবে সেটাই জিজ্ঞাসিত হয়েছে–রাত পোহাবার কত দেরি 'পাঞ্জেরী' বলে।

রাত পোহাবার কত দেরি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার আরো কারণ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ চলে যাবে কি যাবে না তা ছিল অস্পষ্ট। আবার বৃটিশ ভাগলেই যে কবির স্বপ্নের স্বাধীন আবাসভূমি অর্জিত হবে তাও নিশ্চিত ছিল না। কারণ প্রথমত মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা সময়ে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে, আর দ্বিতীয়ত বৃটিশ উত্তর উপমহাদেশে হিন্দু রাষ্ট্র হবে নাকি হিন্দু মুসলিমের মিলিত রাষ্ট্র হবে নাকি ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে এসব নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠির

ভিন্ন ভিন্ন মত ও চাওয়া ছিল। কবি নজরুল ইসলাম তাই তাঁর 'জোর জমিয়াছে খেলা' শীর্ষক কবিতায় লেখেন–

'এদিকে 'রাজী' ও দিকে 'নারাজী' দল,
সেন্টারে পড়ে আছে ভারতের স্বাধীনতা ফুটবল!

অর্থাৎ স্বাধীনতার উষালগ্নে দেখা গেল একদল দেশকে স্বাধীন করতে জীবনপাত করলেও সে মহান বস্তুটি আরেকটি দল চাইছেনা। বৃটিশ শাসনের বেনিফিশিয়ারী একটি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কাছে পরাধীন ভারতই ছিল স্বর্গভূমি। এহেন অবস্থায় প্রায় দুশো বছরের গোলামীর জীবন, অমানিশার রাত পোহাবে কিনা সে জিজ্ঞাসা দেশপ্রেমিকের হৃদয়ে তরঙ্গ তুলবে-এটাইতো স্বাভাবিক। এ তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে পরিস্থিতির শুভাশুভর তারতম্যে হতাশা এসে বাসা বাধতে পারে। কিন্তু এখানে সে বাসা ভিত্তি পায়নি। যাত্রাপথে বাধা-বিপত্তি ও ভুলত্রুটিতে সময় ক্ষেপণ যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু অভিযান মুখ থুবড়ে পড়েনি। সবকিছু উপেক্ষা করে অভিযাত্রী জাহাজ এগিয়ে চলেছে বন্দরের দিকে। জাহাজটি তার কাঙ্ক্ষিত পৌঁছাবে শেষ পর্যন্ত, সে বিশ্বাস হারিয়ে যায়নি। আর জাহাজটি বন্দরে নোঙ্গর করার মানে হল অভিযাত্রীদলের সফর সফল হওয়া গোলামির জিঞ্জির ছিড়ে কাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ করা। দীর্ঘ লালিত স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জন করা। আর যে রাত পোহাবার প্রশ্নে সীমাহীন উদ্বেগ সবকিছুকে আবর্তিত করছিল তারও অবসান সেখানে। কবি এখানে জনগণের প্রতীক। তাই তার উদাত্ত আহ্বান অভিযাত্রীদের এক্ষুণি বন্দরে আবির্ভূত হতে হবে এবং যাত্রাপথের বিলম্বের কারণ দর্শাতে হবে। তাদের ভুল-ত্রুটি আর খেয়ালী খেলায় জনগণের জীবনে যে দূর্ভাগ্য নেমে এসেছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে। সমাগত এ শুভক্ষণের জন্যে দীর্ঘ সফর শেষে আর তর সইছে না যেন। তাইতো তিনি বলছেন–

"জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী কত দেরী।

তার মানে হল অভিযাত্রীদল বন্দরে অবতীর্ণ হলে সকাল হয়ে যাবে সুতরাং রাত পোহাবার দেরী নিয়ে আর প্রশ্ন করতে হবেনা। তখন কেবল সূর্য ওঠার জন্য অতি সামান্য প্রতীক্ষা থাকবে। সে প্রতীক্ষাও হবে আনন্দের-উচ্ছ্বাসের।

স্মরণ করতে পারি স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমির স্বপ্নে বিভোর কবির এ অভিব্যক্তির সময়টি ছিল ১৯৪৩-৪৪ সময়কালে। তার মাত্র তিন/চার বছর পরেই এদেশে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছিল। ১৯০ বছরের বৃটিশ শাসনকালকে সাদিকের সঙ্গে তুলিত হওয়াই স্বাভাবিক। দীঘল রাতের শেষ

নতুন প্রভাতের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতাও খুব স্বাভাবিক। আমাদের জাতীয় জীবনে দীর্ঘ অমানিশার অবসানে নতুন দিন উদবোধনের আকাঙ্খাও অনুরূপভাবে স্বাভাবিক। তাইতো জাতীয় মুক্তি পথের দিশারী কবি ফররুখ আহমদের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাত পোহাবার কত দেরী,কত দেরী। আর এখানেই জাতীয় জাগরণের কবি হিসাবে ফররুখ আমাদের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা দুইই অর্জন করেন।

গণমানুষের কবি ফররুখ আহমদ

ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখন্দ

ফররুখ আহমদকে দুর্বোধ্য কবিদের সারিতে রেখে এড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ আবার বলেন তিনি সমাজের উঁচু শ্রেণীভুক্ত মানুষের কবি। আবার কেউ তাঁকে নিছক ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। মূলত তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি, কবিতার উপমা-উৎপ্রেক্ষাতেও উঠে এসেছে আস্থাবান মানুষের ঐতিহ্য। তাঁর লেখার পরতে পরতে মানবতার বাণী সোচ্চারিত। তাইতো তিনি গণমানুষেরই কবি।

মানুষের জন্যই কবিতা। কবি ও কাব্যচরিত্র মানবতাবাদী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মানবিক কল্যাণের জন্য যিনি চিন্তা করেন কিংবা যিনি প্রকৃতই মানুষের জন্য কাজ করেন তিনিই মূলত মানবতাবদী। এর দুটি ধারা লক্ষ্যণীয়। একশ্রেণীর মানবতাবাদে এমন কিছু প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাসের উদ্ভাবন ঘটে, যা সমাজের দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মানুষের সমস্যা সমাধানে স্রষ্টার উপর বিশ্বাস ও আস্থাশীল থাকার চেয়ে তারা অধিকতর যুক্তিনির্ভর মুক্তি পথের সন্ধানে প্রয়াসী হয়। সে সূত্র ধরেই রাশিয়ান সাহিত্যিক লিও টলস্টয় ও বাংলার কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যসহ অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক এ ধারার মানবতার গান গেয়ে এগিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে অনেকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার প্রয়াসে মানুষের কল্যাণে শাশ্বত মুক্তির পথ রচনা করার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদের জয়গান গেয়ে চলেছেন। ফররুখ আহমদ এ ধারারই মানবতাবাদী কবি। তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শ অবলম্বনে রসূল (স.) প্রদর্শিত মানবতাবাদের বাস্তবায়নের মধ্য

দিয়ে মানবতাকে সরাসরি স্পর্শ করেছেন। রাসূলের (স.) মানবতাবাদ অন্য যেকোন মানবিক আদর্শের চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে উন্নততর। মূলত তাঁর মানবতা বিশ্বমানবের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারোলৌকিক মুক্তির জন্য। তাই ফররুখ আহমদ মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসাবে তাঁকেই গ্রহণ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের আর্বিভাব এবং চল্লিশের দশকের শুরুতে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তিনি আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে প্রেরণা লাভ করেন। বাংলার স্বাধীনতা ও মানবতাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে শহীদ মীর নেসার আলী তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ প্রমুখের স্বাধীকার আন্দোলন ও পরবর্তীতে বালাকোটের রক্তাক্ত ময়দান যেমন চোখে ভাসে তেমনি সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আব্দুল লতীফ, মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ ঐতিহ্যসচেতন মানবতাবাদী ব্যক্তিদের প্রয়াসে কোলকাতায় 'মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' ও ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' মানবতার মুক্তির নিশান বরদার হিসাবে অগ্রগণ্য। অন্যদিকে মার্কস, ফ্রয়েড, ইয়েটস, এলিয়ট, বোদলেয়ার প্রমুখ ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকের বিভিন্নমুখী চিন্তা, ভাব-বিষয় ও আঙ্গিক চেতনার ঢেউ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে বিদগ্ধ মানুষকে যেমন হতাশ করে তুলেছিল তেমনি আশাপ্রদ ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছিল। এসব রাজনৈতিক জটিলতা, বাতাস সাহিত্যের আকাশে ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয়। এমন সন্ধিক্ষণে যারা বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্য চর্চা করতে চেয়েছেন তাদেরকে এসব ধারার কোন একটাতে গা ভাসাতেই হয়েছে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এ প্রেক্ষিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বৃটিশ-বিরোধী মুজাহিদদের রক্ত-পিচ্ছিল পথ, মুনসী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও ইসমাইল হোসেনশিরজীর প্রতিবাদী ধারা এবং মহাকবি ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলামের মানবাতাবাদী বিদ্রোহী চেতনাকে অবলম্বন করে সামনে অগ্রসর হন। আদর্শবাদিতা, রোমান্টিসিজম এবং মেধা ও মননের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাইতো তাঁর সাহসী উচ্চারণ

জীবন আমার করে যেন/ দুঃস্থ জনে সমর্থন
দুঃখী এবং বৃদ্ধ জয়ীফ/ যেন আমার হয় আপন।

মানুষকে খুব আপন করে দেখতেন ফররুখ। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা এমনকি চিন্তার দিক থেকেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। সকল মতাদর্শের কবি-বন্ধুদের সাথেই ছিল তাঁর সখ্যতা। সকল মানুষকেই তিনি সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, এমনকি

যথাসাধ্য সাহায্যও করতেন। কিন্তু নিজে যেমন সাহায্য নেয়াটা পছন্দ করতেন না তেমনি নিজেকে সাহায্যকারী হিসেবে গর্বিতও মনে করতেন না। তিনি সমস্ত মানুষকে আত্মার আত্মীয় বলে মনে করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন "মানষকে জন্মাতে হয় বলেই ভিন্ন ভিন্ন মায়ের পেটে জন্মে। কেউ কাউকে পর ভাবা ঠিক নয়। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তার রক্তীয়, আর যাদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক-আত্মার সম্পর্ক তারাই আত্মীয়, পরম আত্মীয়।" তিনি সকল মানষের সাথেই একাত্ম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আদর্শকে বিকিয়ে দিয়ে নয়। মাখানো ময়দার মধ্যে থেকে চুলকে যেভাবে বের করা হয়, ঠিক সেভাবেই তিনি ঐ সমাজ থেকে নিজের আদর্শকে পংকিলতা মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর কুড়ির দশকে কাজী নজরুল ইসলাম মানবতার জয়-জয়কারের যে সঙ্গীতের দ্বার উন্মোচন করলেন ফররুখ আহমদ সে ধারাকে চল্লিশের দশকে আরো বেগবান করেন। সে সময় কবিতা, গান, খেলাধুলা রাজনীতিসহ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এক নবজাগরণের উচ্ছ্বলতা। ফররুখ সে উচ্ছ্বলতায় গতিময়তা সঞ্চার করতে নির্যাতিতদের পক্ষে লড়াই করেছেন। নজরুল যখন ঘোষণা করলেনঃ

প্রার্থনা করো, যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)এর যোগ্য আনুসারীদের ডেকে কাফেলাকে সমৃদ্ধ করে শোষকের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি উচ্চারণ করেনঃ

আজকে উমরপন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ী দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
উষর পথের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা
দিক-দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।

ফররুখ আহমদের মানবতাবদী মনের হাহাকার লক্ষ্য করা যায় তেরশ' পঞ্চাশ অর্থাৎ উনিশ তেতাল্লিশ সালের অবিভক্ত বাংলার মন্বন্তরের সময়। মানবতাবাদী কবি সুকান্ত যখন বলেন-

কবিতা তোমায় দিলেম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

এসময় কবি ফররুখ আহমদের চোখে ভেসে ওঠে ক্ষুধিত লাশের সারি। কলকাতার প্রশস্ত কালো পিচঢালা ঝকঝকে পরিষ্কার রাস্তায় সন্ধ্যারাতে খুঁজে পান ক্ষুধিত লাশ; মুখগুঁজে পড়ে আছে অভিজাত লোকজনের যাত্রাপথে, কেউ খবর রাখছে না। তাই তাঁর কষ্টের পংক্তিমালা-

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়
কালো পিচঢালা পথে লাগে নাই ধুলির আঁচড়
সেখানে পথের পাশে মুখঘুঁজে পড়ে আছে জমিনের পর
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখেনা সে মৃতের খবর।
জানি মানুষের লাশ মুখগুঁজে পড়ে আছে ধরণীর পর
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে পড়ে আছে নিসার নিথর
পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর পাথরের ঘর।

হায় বিচিত্র পৃথিবী! মানবতা আজ কোথায়! যেখানে ক্ষুধা-দারিদ্রের কষাঘাতে প্রতিনিয়ত আত্মার মৃত্যু ঘটছে সেখানে শোষকশ্রেণীর দুয়ার বন্ধ করে ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে মানুষের হাড় নিয়ে খেলাঘর রচনা করছে পৈশাচিক লোভ তাদের মুনষ্যত্বকে হরণ করে নিয়েছে এবং তাদের নৃশংসতা দিনের পৃথিবী ও রাতের আকাশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। একদিকে মানুষের আর্তনাদ অন্যদিকে শোষকের অট্টহাসি। একদিকে মৃত্যু-ফাঁদ, অন্যদিকে পরিহাস, একদিকে গোলাপের পাঁপড়ি অন্যদিকে আবর্জনা, একদিকে আকাশে রঙ্গিন খিলান অন্যদিকে বিষাক্ত কামনা। চারিদিকে হাহাকার। নারী শিশু কেউ বাদ যায়না মানবতাহীন আচরণ থেকে। কবির ভাষায়-

চলে দল বেঁধে শিশু ওষ্ঠে তুলি জীবনের
পানপাত্র সুতীব্র বিষাদ
মানুষের বুভুক্ষু মুমূর্ষূ আউলাদ
এ কোন পরীক্ষা?
এখানে জ্বলিছে শুধু ক্ষুধাতুর দিবসের শিখা
বিষাক্ত ধোয়ার কুজ্বটিকা
মৃত্যুর বিকট বিভীষিকা।
মজলুম মনের বোঝা, ভারাক্রান্ত বেদনা অগাধ
তারি মাঝে লাথি খেয়ে চলে আজ আদমের মৃত আউলাদ।

হায়েনারূপী শোষকের বৈদ্যুতিক চাহনিকে ভয় পাননি কবি। আশাবাদী কবি মনে করেন এ শোষণ-ত্রাসন-নির্যাতন চিরদিনের নয়; ইতিহাস অনুসন্ধানী কবি তাই ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে সান্ত্বনা খোঁজেন। সামুদ, ফেরাউন, নমরুদসহ পরাক্রান্ত ঔদ্ধত্যবাদীদের পতনের কাহিনী সামনে তুলে ধরেন তিনি।

অনেক সভ্যতা জানি মিশেছে ধূলির
নীচে,অনেক সামুদ
কত ফেরাউন, কত জালিম পিশাচ
নমরুদ

মিশে গেল ধূলি তলে
নতুন যাত্রীর দল দেখা দিল দূর্গম পথে
উড়ায়ে নিশান
সাথে করে নিয়ে এল জীবনের অশ্রান্ত
তুফান

তিনি আরো উল্লেখ করেন-

মজলুমানের রক্তে এখনো পৃথ্বি লাল
কোথায় ওড়াবো শান্তি প্রতীক আল হেলাল?
ঘোরে বভুক্ষু জনগণ পথে পাংশু মুখে
দ্বার থেকে দ্বারে ফেরে তার দাবী ক্লান্ত বুকে
চির পলাতক শিকার সে হোক দৃপ্ত আজ
মানবতা হোক নির্যাতনের মাথার তাজ

শুধু ক্ষুধা-দারিদ্রই মানুষকে লাশে পরিণত করে না বরং নৈতিকতা-বিধ্বংশী সংস্কৃতি ও চিন্তার বিকৃতি মানুষকে চিরদিনের জন্য লাশ বানিয়ে ফেলে। ফররুখ আহমদ তা সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তিনি সমস্ত নীতি-নৈতিকতাহীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উচ্চারণ করেন-

দল বেঁধে চলিছে শিশুরা মড়কের পথে
কুৎসিত কুটিল কালো অন্ধকার শড়কে বিপথে
যেখানে প্রত্যেক প্রান্ত আজাজিল পাতিয়াছে ফাঁদ
তারি পানে দুনিয়ার টানে চলে আজ মানুষের
দুর্বল, বির্শীর্ণ আউলাদ।

কবি নিজে ছিলেন নীতিগত দিক থেকে আলিফের মতো খাড়া। স্বার্থান্ধতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্বভাবে, অভাবে, সুখে-দুঃখে কোন সময়ই তিনি চাটুকারিতার আশ্রয় নেন নি। দুনিয়ার তথাকথিত বৈভব, সাফল্য তাঁর কাছে ছিল এক পাশবিক মত্ততা। কবি কামরুল হাসানের ভাষায়-"আপন বিবেকের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতেই হবে, আপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলের বহু কিছু আমরা মেনে নিয়েছিলাম। আমরা যারা ১৯৭১ সালের সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের বহুসংখ্যক মহারথীই পশ্চিম পাকিস্তানে বহুবার পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ঘুরে এসেছিলাম। কিন্তু নীতির যুদ্ধে যে লোকটিকে আমরা চিরকাল শত্রু শিবিরের লোক বলেই চিহ্নিত করে এলাম, সেই ফররুখ ভাইকে গত তেইশ বছরের পাকিস্তান সরকার একটি দিনের জন্যও পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে পারেনি। এটা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব ঘটনা এবং পর্বত শিখরের মতই নিজের একান্ত মতবাদে অটল ছিলেন ফররুখ ভাই।" তাঁর মূল সূর ছিল

তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

এমনকি, যারা স্বার্থ হাসিলের জন্য নীতি বিসর্জন দেয়, তাদের জন্য তিনি শিশুতোষ কাব্য নাটিকায় বাদুরের সাথে তুলনা করেন এবং শেষ পংক্তিতে প্রমাণ করেছেন-'সুযোগ মতো যারা ও ভাই মতটা বদল করে/অতি চালাক বাদুরগুলোর মতই তারা মরে।' নৈতিক অবস্থানকে মজবুত রাখতে শিশু-কিশোরদেরকেও নির্যাতিত অভাবী ও দুঃস্থজনের পার্শ্বে দাঁড়ানোর ছবক দিতেন কবি ফররুখ । তিনি বলেন-

খোকন যাবে কার বাড়ি?
খোকন যাবে তার বাড়ি
নাই জামা যার নাই গাড়ি।

পাকিস্তানের সমর্থক আখ্যা দিয়ে ফররুখ আহ্মদকে কেউ কেউ ভিন্ন চোখে দেখার চেষ্টা করেন। সত্যিকার অর্থে তিনি পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন না বরং একজন মানবতাবাদী হিসেবে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ। বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁর স্বাধীনচেতা অন্তর সব সময় অস্থির ছিল। মুসলমানদের হাতে দেশের ক্ষমতা এলে মানবতা বিকশিত হবে এটা তাঁর স্বপ্ন ছিল। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী জাতিকে হতাশ করেছে। এমনকি এ হতাশাব্যঞ্জক আচরণের কারণে তিনি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে কোন মোসাহেবী তো দূরের কথা তাদের পছন্দসই কোন কথাই বলেননি। এমনকি পাকিস্তানী শাসকদের অনভিপ্রেত কার্যাবলীর প্রেক্ষিত্রে তিনি 'রাজ রাজরা' নামক ব্যঙ্গ নাটকের মাধ্যমে তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

মানুষের সুখ-দুখ দিয়েই কবির পথ চলা, একথা আগেই বলা হয়েছে। মানুষের অধিকার যার হাতে ক্ষণ্ন হয় সে তাঁর বন্ধু হলেও তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পরই যখন তিনি বাংলা ভাষার ক্রান্তিকালের আভাস পেলেন তখনি তিনি ভাষার পক্ষে প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে জোরালো যুক্তি। প্রবন্ধের সূচনাই তিনি করেছিলেন এভাবে- "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্র সমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা।" ভাষা আন্দোলন শুরুর পূর্বেই তাঁর এ প্রবন্ধ ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রবন্ধে তিনি গণতান্ত্রিক ধারাকে মুক্তির মোহনায় এনে প্রমাণ করেছেন যে তিনি একজন গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী মানুষ।

সত্যিকার অর্থে মানবতার মুক্তির জন্য চাই উমরের মত দরাজ দিলের

মানুষ। এ প্রত্যাশায় কবি বলেনঃ

লুণ্ঠিত হলে মানবতা তুমি/জাগো অনাচার বাঁধন টুটি
প্রবল লাথিতে ভেঙ্গে ফেলে ছেঁড়ো/সব জালিমের পাপের ঝুটি।

পূর্বসূরী তীতুমীরের আন্দোলন সম্পর্কেও কবির মূল্যায়ন;

তীতুমীরের স্বপ্ন সফল হবে'
যেদিন ধরায় জুলুম নাহি রবে।

জালিমের নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, অমানবিকতা ও অসহায়াদের চিত্রিত করতে ফররুখ নির্মাণ করেছেন বিরান সড়কের গান, তুলে এনেছেন অসহায় মানুষের 'আউলাদ, পথে পথে খুঁজেছেন 'লাশ' আর মুক্তিকামী মানুষের জন্য খুঁজে ফিরেছেন উমর দরাজ দিল' সাত সাগরের মাঝি হয়ে সফর করেছেন 'বার দরিয়ায়' পরখ করেছেন 'দরিয়ার শেষ রাত্রি' সিন্দবাদকে ডেকে হাতেম তায়ীকে সঙ্গী করে হেরার রাজ তোরণে' পৌঁছতে চেয়েছেন সগৌরবে। মজলুম মানবতাকে উদ্ধারের জন্য তাই আয়েশী জীবন ফেলে কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করার জন্য গণমানুষের প্রতি কবির উদাত্ত আহবান-

'ছিড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ।

ফররুখ একাডেমী পত্রিকার নিয়মাবলী

* **কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বছরে দু'বার সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়।**
* **ফররুখ-বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ ও ফররুখ আহমদকে নিবেদিত কবিতা সমৃদ্ধ সংকলন।**
* **মানসম্মত ফররুখ-বিষয়ক যেকোন লেখা সাদরে গৃহীত হয়।**
* **প্রতি সংখ্যার মূল্য মাত্র ২৫ টাকা। ডাক মাশুল ভিন্ন।**
* **এজেন্টদের জন্য বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।**
* **লেখার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ**
  সম্পাদক, ফোন ঃ ৮৮৩৭৫৪০, ০১৮১৯-৪২০৪৮৯
* **বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

৬২/১, পুরানা পল্টন (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯।
www.farrukhfoundation.org

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন-এর সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী

ফাউন্ডেশন-এর সদস্য দু'প্রকার- (১) সাধারণ সদস্য ও (২) জীবনসদস্য
সাধারণ সদস্যদের ভর্তি ফি-পঁচিশ টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা দু'শ টাকা মাত্র এবং জীবন

নিবেদিত কবিতা

রেঁনেঁসার কবি

জালাল খান ইউসুফী

তিনি সেই নুরু নয় এ আরেক নুরু যে
কবিতার পৃথিবীর নিজরূপ সুরুজে
ঝলমলে আলো নিয়ে উঠেছিল সূর্য।
তার ত্যাজে কেঁপেছিল ব্রিটিশের তুর্য।

ঘুম ভেঙ্গে উঠেছিল মজলুম জনতা,
বুঝেছিল শোষকের শোষণের ঘণতা।
পাক আর ভারতের মাঝে হয় খণ্ড,
বিটিশের কূটচাল হয়ে যায় পণ্ড।

মুসলিম ভাই ভাই এক সাথে থাকবে,
সুখে দুঃখে সহোদর বুকে বুক রাখবে।
কিন্তু সে চিন্তাও ভেঙে যায় হাড়িতে,
সহোদর দাঁড়ালো যে শোষকের সারিতে।

ইতিহাস কথা বলে সিরাজুম-মুনিরা,
কোথা সেই আমরা'র মুসলিম গুণিরা।
প্রতিবাদ করে ওঠে কবিতা ও কবি যে,

তার মাঝে দেখে কেউ নজরুল ছবি যে ।

নিপীড়িত মজলুম পায় নব দীক্ষা,
ফররুখ শেখালেন রুখে উঠা শিক্ষা ।
জাতীয়তা বাঙালি কি মুসলিম ধর্ম,
বাঁচিয়ে তা রাখবার কর সব কর্ম ।

চিন্তা ও চেতনায় ছিল তার পরসুখ,
ইসলামী রেঁনেসার কবি তিনি ফররুখ ।

ENGLISH SECTION

In an Ancient Shrine
By Farrukh Ahmad

Translation: Sayeed Abubakar

A few bones of a man lying on the bed of an ancient shrine
listen to the song of a sleepless bird of night. The mountain
of his memory descends upon him becoming his solid night
more condensed. These nights are only for talking attentively
with ownselves. I know— the passenger—the guest of earth
once saw a beautiful seductive world in illusions; that collected
memory is now an abortive elegy of his life. There remain now
the song of the sleepless bird and a hillock of solid darkness

which is, as it were, a shoal of sand; beside its two banks
there flows a fast current of rolling waves. In that lifeless white shoal
of sand, there blows the firm Pakhwaj beside the burial cloth. Who
hear, lying in the lap of ancient bricks, the uncountable errors
falling down into the innumerable unconquerable holes of death?
The song of the sleepless bird causes the shrine to quiver.

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
ফররুখ প্রতিভা	মুহম্মদ মতিউর রহমান	৪০০
সংস্কৃতি	মুহম্মদ মতিউর রহমান	১৭৫
ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার	মুহম্মদ মতিউর রহমান	৮০

অভিভাষণ

ডক্টর আনিসুজ্জামান

(কবি ফররুখ আহমদের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিগত ১৮.১০.২০১২ তারিখে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে মান্যবর অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, মননশীল লেখক ও বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান প্রফেসর এমিরেটাস, ডক্টর আনিসুজ্জামান যে ভাষণ দেন, তার হুবহু অনুলিপি নিচে মুদ্রিত হল।- অনুলিখন: সম্পাদক, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন।)

প্রীতিভাজন সভাপতি, বিশিষ্ট আলোচকবৃন্দ ও সুধিবৃন্দ।

ফররুখ আহমদ এমন একজন কবি, যাঁর কবিতাকে তাঁর জীবনদৃষ্টি থেকে আলাদা করা যায় না। এ জীবনদৃষ্টির সাথে যাদের সাযুজ্য তারা তাঁকে অনেক বেশী আন্তরিকভাবে ও মর্মগতভাবে গ্রহণ করেন। যাদের সাযুজ্য নেই তারাও তাঁকে শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে তাঁর যে গুণ সেটা স্বীকার করেন। আমার শিক্ষক মুনীর চৌধুরীর সাথে যখন ফররুখ আহমদের প্রথম দেখা হয়, মুনীর চৌধুরী নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার এ শ্মশ্রু কি বিশ্বাসজাত না আদর্শজাত? ফররুখ আহমদ নাকি কোন উত্তর দেননি, শুধু হেসেছিলেন। কিন্তু সেই থেকে তারা সম্পুর্ণ ভিন্ন পথের পথিক হয়েও একটা বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন।

মুনির চৌধুরী বরাবর ফররুখ আহমদের শিল্প-প্রতিভার প্রশংসা করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফররুখ আহমদের 'হরফের ছড়া' ও 'পাখির বাসা' যখন প্রকাশিত হয় তখন মুনীর চৌধুরী তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর একটি কারণ হলো, 'হরফের ছড়া' যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের এখানে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কথা হচ্ছে। এরমধ্যে ফররুখ আহমদ ১২টি স্বরবর্ণ ও ৪০টি ব্যঞ্জণ বর্ণ নিয়ে চমৎকার ঐ ছড়ার বইটি লিখলেন। কারণ ১২টি স্বরবর্ণের মধ্যে চার চার করে বিভক্ত তিনটি স্তরে একটি অখণ্ড ছন্দের দোলা আছে। ফররুখ আহমদ সেজন্য এ বারটি বর্ণই রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি এটা ভাঙতে চাননি বা এর কোন একটি বর্ণই বাদ দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। এ কথাটি মুনীর চৌধুরী তাঁর 'হরফের ছড়া' গ্রন্থ আলোচনায় উল্লেখ করেন।

ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলা কাব্যের মূলধারার কবি হয়েও একটি স্বতন্ত্র সুর যোজনার চেষ্টা করেছেন বা করতে সফল হয়েছেন। আমরা জানি যে, চল্লিশের দশকে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান আমাদের এ চারজন প্রধান কবি প্রায় একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এঁরা চারজনই আমাদের প্রথম আধুনিক কবি। এঁদের মধ্যে আবুল হোসেন

ব্যতিত আর কেউই বর্তমানে জীবিত নেই। এঁরা সকলেই নিজের নিজের মত করে তাদের স্ব-স্ব কাব্যভুবন সাজিয়েছেন। একজনের সাথে আরেকজনের সাজুয্য তেমন একটা না থাকলেও মনে হয়েছিল রবীন্দ্রত্তোর যুগে যে আধুনিক কাব্যধারা-এঁরা সে পথেরই পথিক। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা দেখিয়েছেন যে, সে ধারা থেকে তাঁরা স্বতন্ত্র ধারার পথিক। তাঁরা মূলত স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন।

এঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ ছিলেন সর্বাধিক উজ্জ্বল। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুলের পরে তিনি সর্বাধিক সফলতা অর্জন করেন। তবে শুধু এর মধ্যেই তাঁর নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নিজস্ব কবি-ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো কতগুলো বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজুম মুনীরার' যে কবি-ভাষা তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থ যেমন-"হে বন্য স্বপ্নেরা", 'মূহূর্তের কবিতা', 'দিলরুবা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের ভাষার সাথে এর কোন মিল নেই। বিষয়ানুযায়ী ভাষার পার্থক্য তিনি করেছেন। এমনকি, তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার ভাষা আরো ভিন্নতর। 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ইত্যাদি ছদ্মনামে তিনি যেসব ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন তার ভাষা বিষয়ানুযায়ী ভিন্নতর হয়েছে। একজন সচেতন শিল্পী হিসাবে তিনি জানতেন, বিষয়ানুযায়ী শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। তবেই কবিতা সফল হয়। এটাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতা অনেকে উপলব্ধি না করেই তাঁকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। ফলে আমরা পূর্ণাঙ্গ ফররুখকে পাইনা, তাঁকে পাই খণ্ডিত আকারে। কিন্তু ফররুখের সমগ্র রচনাবলী দিয়েই তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

ফররুখ আহমদ বিশেষভাবে মুসলিম পুনর্জাগরণে বিশ্বাস করতেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি কতগুলো প্রতীক ব্যবহার করেছেন। 'সিন্দবাদ' প্রতীকে তিনি মুসলিম পুনর্জাগরণের কথা বলেছেন। এখানে তিনি আরবি, ফারসি শব্দ এবং সেসব সাহিত্য বিশেষত ফারসি সাহিত্য থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সবই যে মুসলমানদের সম্পদ, তা কিন্তু নয়। যেমন হাতেম তা'য়ীর কথা ধরা যাক। হাতেম তা'য়ী তো প্রাক-ইসলামী যুগের চরিত্র। কিন্তু তিনি আরবি সাহিত্যের এক অপরিহার্য চরিত্র। সে হিসাবে তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির নিকটেই অত্যন্ত আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। সে কারণে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবি সৈয়দ হামজা, হাতেম তা'য়ীর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, এত বড় একজন মহৎ ব্যক্তি যদি মুসলমান হতেন, তাহলে কতই না ভাল হত। তাঁরাও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একটি ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। ফররুখ আহমদও হাতেমের এ মানবিক গুণের প্রতি মুগ্ধ হয়েই তাকে তার কাব্যে স্থান দিয়েছেন। ঐতিহ্যের কবি ফররুখ আহমদ হাতেমকে মুসলিম ঐতিহ্যের এক গৌরবময় চরিত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেখানে বিষয় আলাদা তিনি সেখানে আলাদাভাবেই বিচরণ করেছেন। তাঁর এ বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে হবে।

ফররুখের 'হাতেম তা'য়ী' প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো এই যে, বিংশ শতাব্দী মহাকাব্যের যুগ নয়। সেজন্য হাতেম তা'য়ী রচনার মধ্যে দেখবো, মধুসূদনের মহাকাব্যের যে ধরণ, এটা ফররুখ সম্পর্ণ গ্রহণ করেননি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, সেই সঙ্গে অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা মহাকাব্যের যুগ না হওয়ায় এত বড় বই আমাদের নিকট অতটা

আবেদন বহন করে না, যতটা তাঁর খণ্ড কবিতা আমাদের নিকট আবেদন সৃষ্টি করে। তবে একথা বলতেই হবে যে, হাতেম তা'য়ীর মধ্যেও কিছু কিছু অসাধারণ কবিত্ব রয়েছে, যা পড়ে আন্দোলিত হওয়া যায়, কিন্তু সবটা মিলে হয়তো অতটা তৃপ্তি পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু অন্যত্র ফররুখ আহমদের সিদ্ধি অসাধারণ। তাঁর কবি-কল্পনার মধ্যে, কবিতার শিল্পরূপ সম্পর্কে যে সচেতনতা তা তুলনাহীন। এর নানা পরিচয় আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে এখানে মাত্র তাঁর 'দিলরুবা' কাব্যের কথা উল্লেখ করবো। এটা একটি প্রেম বিষয়ক কাব্য। ইংরেজিতে এটাকে সনেট সিকোয়েন্স বলা যায়। এখানে মোট ৪৮টি সনেট কবিতাকে মোট ৭টি স্তবকে বিভক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করা হয়েছে। এক একটি স্তবকে ৫ থেকে ১০টি পর্যন্ত কবিতা রয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতাই সনেটের প্রকরণ অনুযায়ী রচিত এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি সনেটই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অর্থবহ। আলাদাভাবে প্রত্যেকটি কবিতাই মূল্যবান কিন্তু ঐ স্তবক-বিন্যাসের জন্য প্রতিটি কবিতাই পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে একটি অখণ্ড ভাব ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। এ স্তবক-বিন্যাস তিনি ইংরাজি সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাংলায় তিনি এটা এমনভাবে প্রবর্তন করলেন, যা খুব অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো এবং কবিদের নিকট একটি অনুসরণীয় বিষয়ে পরিণত হলো। কাজেই তিনি যে শব্দ নির্বাচন ও তার কুশলী প্রয়োগে দক্ষ ছিলেন তাই নয়, কবিতার বিভিন্ন রূপরীতি সম্পর্কেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নানাভাবে তিনি পরীক্ষা করেছেন এবং সেই পরীক্ষার ফল সাধারণভাবে সন্তোষজনক হয়েছে এবং আমরা নতুন কিছু পেয়েছি। একারণেই ফররুখ আহমদ তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবি।

ফররুখ আহমদ একটি বিশেষ যুগের কবি, একটি বিশেষ ভাবধারার কবি। কিন্তু তাঁর কাব্য-সিদ্ধি এমন যে, তিনি তাঁর যুগকে অতিক্রম করে, সে ভাবধারাকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর অসাধারণত্ব ও কবি-প্রতিভার অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি যে, ফররুখ আহমদকে নিয়ে একটি বিতর্কের জায়গা সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক সৃষ্টি হতেই পারে, আমরা কেউ বিতর্কের উর্দ্ধে নই। কিন্তু সব বিতর্কের উর্দ্ধে ফররুখ বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ কবি, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ফররুখ আহমদ স্বাধীনতার কবি। তিনি পরাধীন যুগে জন্মেছিলেন। আমরা তখন ইংরাজের গোলামী করেছি। তখন পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল। উপ-মহাদেশের সকল মুসলমানই পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। ফররুখ আহমদও মনে-প্রাণে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। সে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় আশাভঙ্গের বেদনায় তিনি অনেক ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন একজন কবি এবং সকল মানুষের কল্যাণকামী।

ফররুখ আহমদের মত নির্লোভ, উদার, মানবতাবাদী মানুষ আমি কমই দেখেছি। ফররুখ আহমদ সারা জীবন তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলেছেন। কারো কাছে তিনি কোন ব্যাপারে মাথা নত করেননি। আমাদের দেশে যখন এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক সরকারের প্রসংশার কাজে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে নানা এনাম-উপঢৌকন পেতে ব্যস্ত ছিলেন, ফররুখ আহমদ তখনও সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে তা থেকে দূরে ছিলেন। আমার মনে আছে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন

রাইটার্স গিল্ড প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আমরা সকলেই সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশের নামী-দামী কবি-সাহিত্যিকরা অনেকেই ছিলেন। ফররুখ আহমদও প্রথম দিকে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাইটার্স গিল্ড –এর ব্যাপারে তাঁর আর কোন আগ্রহ ছিলনা। এমনকি, রাইটার্স গিল্ডের সেক্রেটারী জেনারেল কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব বিশিষ্ট উর্দু কথাসাহিত্যিক কুদরতউল্লাহ শাহাব যখন ফররুখ আহমদকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তখন তিনি সে আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। ফররুখ আহমদ বলেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি যেন আমার বাসায় আসেন। কুদরতউলাহ শাহাব অগত্যা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিজেই ফররুখ আহমদের বাসায় গিয়েছিলেন। এই হলো কবি ফররুখ আহমদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর মত অসামান্য আত্মমর্যাদাশীল কবি আমাদের দেশে অতিশয় বিরল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ফররুখ আহমদের স্নেহধন্য। আমি যখন ছাত্র, তখন আমার দু'একটি লেখা পড়ে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং নানা বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিতেন। আমি তাঁর পরামর্শে যথেষ্ট উৎসাহবোধ করেছি। আরেকটি ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই। ১৯৫৪ সনে আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক কবি-সাহিত্যিকদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। তাঁদের মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ফররুখ আহমদের সাথে তাঁর দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে। আমি নিজে থেকে সে ব্যবস্থা করেছিলাম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ফররুখ আহমদ একসঙ্গে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁরা পরস্পর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। সুভাষ এসেই বললেন, আমি ফররুখ আহমদের সঙ্গে দেখা করবো। আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ফররুখ আহমদের সঙ্গে দেখা করাতে। তখন ঢাকা বেতার কেন্দ্র ছিল নাজিমুদ্দীন রোডে। বেতার কেন্দ্রের সামনে আবন মিয়ার চায়ের দোকানে ফররুখ আহমদের সঙ্গে দেখা। দুই বন্ধু দেখা হলে দু'জনেই গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তাঁরা সেই ছাত্র-জীবনের মতই অন্ত রঙ্গভাবে কথা বলতে লাগলেন। ফররুখ আহমদের একটি সরলতা ছিল। সুভাষের মধ্যে তাঁর এ সহপাঠী বন্ধুটি সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাব ছিল।

ফররুখ আহমদ মানুষ হিসাবে অসাধারণ, কবি হিসাবে দুর্লভ, আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে শেষ করছি।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে–

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত

ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

শীর্ষক পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ একটি মূল্যবান গ্রন্থ।
দেশের বিশিষ্ট লেখকদের এ সংকলন গ্রন্থটি কবি ফররুখ আহমদের
জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জানার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ।
ফররুখ চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটি এক বিরল সংযোজন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৬২/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৫৭৮৬৯, ০১৮১৯৪২০৪৮৯।

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন

বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব কনফারেন্স লাউঞ্জে ১৮ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৪ টায় এক আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও নিবেদিত কবিতা পাঠের আয়োজন করা হয়।

ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মান্যবর অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, গবেষক ও মননশীল লেখক বাংলা একাডেমীর সভাপতি প্রফেসর এমিরেটাস ডক্টর আনিসুজ্জামান। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক জুবাইদা গুলশান আরা। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিক, সংগঠক ও ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি মাহবুবুল হক, অধ্যাপক আশরাফ জামান, কবি আহমদ আখতার (কবিপুত্র), কবি লিলি হক, এডভোকেট এম. আশরাফ উদ্দীন, সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান বাচ্চু (কবিপুত্র) ও কবি আহমদ বাসির। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কবি মনিরুজ্জামান পলাশ।

ড. আনিসুজ্জামান তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে বলেন, "আহমদ ফররুখ আহমদ এমন একজন কবি, যাঁর কবিতাকে তাঁর জীবনদৃষ্টি থেকে আলাদা করা যায় না। এ জীবনদৃষ্টির সাথে যাদের সাযুজ্য তারা তাঁকে অনেক বেশী আন্তরিকভাবে ও মর্মগতভাবে গ্রহণ করেন। যাদের সাযুজ্য নেই তারাও তাঁকে শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে তাঁর যে গুণ সেটা স্বীকার করেন। তাঁর মত নির্লোভ, উদার, মানবতাবাদী মানুষ আমি কমই দেখেছি। তিনি সারা জীবন তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলেছেন। কারো কাছে তিনি কোন ব্যাপারে মাথা নত করেননি। তিনি মানুষ হিসাবে অসাধারণ, কবি হিসাবে দুর্লভ।" তিনি বলেন, ফররুখ আহমদের সম্পূর্ণ রচনাবলী আজও প্রকাশিত হয়নি, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী এ ব্যাপারে আংশিক কাজ করলেও তা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। আমি আশা করবো, বাংলা একাডেমী ফররুখ আহমদের সমগ্র রচনাবলী মুদ্রণ ও পূনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করবে। বাংলা একাডেমীর সভাপতি হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও আমি এ কাজটি যাতে সম্পন্ন হয় সে অনুরোধ আমি একাডেমী কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মান্যবর অতিথি ডক্টর আনিসুজ্জামান

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি অধ্যাপক জুবাইদা গুলশানা আরা বক্তৃতারত। পাশে উপবিষ্ট (বামদিক থেকে) অধ্যাপক আশরাফ জামান, মাহবুবুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ও মান্যবর অতিথি ডক্টর আনিসুজ্জামান।

তিনি আরো বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি ফররুখ আহমদের স্নেহধন্য। আমি যখন ছাত্র, তখন আমার দু'একটি লেখা পড়ে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং নানা বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিতেন। আমি তাঁর পরামর্শে যথেষ্ট উৎসাহবোধ করেছি। কবি হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য সর্বদাই তাঁকে স্বরণীয় করে রাখবে।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বলেন, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তিনি স্বাধীনতার পক্ষে, মানবতার পক্ষে এবং নবজাগরণের নকীব হিসাবে একজন দিশারী কবি। তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর তিনি প্রথম বছরেই বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে তাঁর রচিত 'পাখির বাসা', 'হাতেম তা'য়ী' প্রভৃতি কাব্য এবং ১৯৯৫-৯৬ সনে ফররুখ আহমদের রচনাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলো এখন অপ্রাপ্ত। উপরন্তু ফররুখ রচনাবলীর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশেরও কথা ছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়নি। উপস্থিত সবার পক্ষ থেকে তিনি বাংলা একাডেমীর প্রতি ফররুখ আহমদের রচনাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রণ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের আবেদন জানান। তিনি বলেন, সৃজনশীল প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় তাঁর সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে নিহিত। অতএব, ফররুখ আহমদকে জানতে হলে তাঁর গ্রন্থাদির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর রচনাবলী বাজারে দুষ্প্রাপ্য। এর আশু অবসান দরকার। ফররুখ আহমদের রচনাবলী সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এটাকে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ হতে পারে না। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলা একাডেমীকে তাই ফররুখ রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যাপিকা জুবাইদা গুলশান আরা বলেন, ফররুখ আহমদ ভাষা আন্দোলনে একজন অগ্রসেনানী ছিলেন। তাঁর নামের আগে অনেক ধরনের বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সর্বপোরি তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবি। তাঁর প্রতিভার

বক্তৃতা দিচ্ছেন কবিপুত্র আহমদ আখতার

বলেই তিনি কালকে অতিক্রম করে মৃত্যুর চার দশক পরও তিনি আমাদের একজন প্রিয় ও অপরিহার্য কবি হিসাবে বিবেচিত। ফররুখ আহমদের প্রিয় কবি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেল ছিলেন ক্লাসিক কবি। তিনি তাঁর কাব্য রচনায় ক্লাসিক ভাবধারা রূপায়ণের উপযোগী নতুন ভাষা তৈরী করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শে তিনি নতুন কাব্যিক ফর্ম ও নানা শিল্প- সৌকর্য নিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্য রচনা করেন। ফররুখ আহমদও মাইকেলের মত ক্লাসিক কবি এবং নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াসী। তবে ফররুখের মধ্যে ক্লাসিক ধর্মিতার সাথে রোমান্টিকতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। ফররুখ ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন আমরা পরাধীন, নানা ভাবে দেশ ও জাতি অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে গেছে। ফররুখ এসে এ পরাধীন জাতিকে তার আত্ম-পরিচয় দান করলেন, জাগরণের মন্ত্রে তাদের উদ্বুদ্ধ করে নতুন পথের নির্দেশনা দিলেন। এর ফলশ্রুতিতে আমরা পেলাম তাঁর বিখ্যাত 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজুম মুনীরা', 'কাফেলা' ইত্যাদি কালজয়ী কাব্য। ফররুখ ছিলেন মানবতাবাদী কবি। তাই তিনি পুঁজিবাদী সভ্যতার বিনাশ কামনা করে ক্ষুধিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। 'হাতেম তা'য়ী', নৌফেল ও হাতেম' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যার মূল সূর মানবতার অন্তরঙ্গ আবেদনে ভরপুর। তিনি আত্মনিমগ্ন ও আত্মাভিমানী কবি ছিলেন, তিনি ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাশীল কবি। তাঁর কবিতার মধ্যে এর পরিচয় বিধৃত। ফররুখ তাঁর নিজস্ব কবি-ভাষা সৃষ্টিতে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর আগে একমাত্র মাইকেল এবং নজরুলের পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছে। ফররুখ আহমদ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, সেখানে প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি ঘটেনি। তাই স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনায় তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। এভাবে ফররুখ আহমদের মধ্যে আমরা বৈচিত্র্য খুঁজে পাই। নানা কারণে ফররুখকে অনেকে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু তাঁর মত অসাধারণ কবি-প্রতিভা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাই তাঁকে আজ যথাযথভাবে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে।

আহম্মদ আখতার বলেন, আমার আব্বা বেঁচে থাকতে আমাদের বাসায় যাঁদের নাম প্রায়ই উচ্চারিত হতো তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী অন্যতম। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর নামে আমার আব্বা তাঁর লেখা 'হরফের ছড়া' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন। মুনীর চৌধুরী এ বইটির উপর একটি আলোচনা লিখে বেতারে সম্প্রচার করেন। তিনি তাঁর লেখায় বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এভাবে বাংলা একাডেমী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং তার শিক্ষকদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই আমাদের একটি ধারণা জন্মে। ১৯৭৫ সনে আব্বার মৃত্যুর পর মরহুম কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ যখন আব্বার নির্বাচিত কবিতা নিয়ে "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা" নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করেন,তখন ডক্টর আনিসুজ্জামান বিদেশে ছিলেন। বিদেশ থেকে

এসে তিনি গ্রন্থটি দেখে মান্নান সৈয়দকে বলেছিলেন, 'তুমি যথার্থই একটি ভাল কাজ করেছো'। একথা আমি মান্নান সৈয়দের মুখে শুনেছিলাম। বাংলা একাডেমী প্রথম আমার আব্বার লেখা 'পাখির বাসা', 'হাতেম তা'য়ী' ইত্যাদি বিখ্যাত গ্রন্থগুলো প্রকাশ করে। আমি যতদূর জানি, আমার আব্বা কখনো আড়ম্বরপূর্ণ বিলাশী জীবন চাননি। তাঁর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া ছিল অত্যন্ত সাধারণ। কিন্তু কবি হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন এবং কবি হিসাবেই তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। আমি মনে করি এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। তিনি সবসময় নিজেকেই অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। তাই সময়ের সাথে তাঁর কবিতায়ও রূপান্তর ঘটেছে। তিনি ছিলেন

কবিপুত্র সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান বাচ্চু বক্তৃতারত। মঞ্চে উপবিষ্ট (বামদিক থেকে) মনিরুজ্জামান পলাশ, আশরাফ জামান, শাহ আবদুল হালিম, মুহম্মদ আবদুল হান্নান, মুহম্মদ মতিউর রহমান, অধ্যাপক জুবাইদা গুলশানা আরা, কবি লিলি হক ও মানসুর মুজাম্মেল।

কঠোর অনুশীলনে বিশ্বাসী। তাঁর শিল্পবোধ ছিল অতি সূক্ষ্ম। তাই তিনি নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির কাজে নিরন্তর ব্যাপৃত থেকেছেন। ফররুখ পুঁজিবাদের বিরোধী ছিলেন। কমউনিজমকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মানবতাবাদী এম. এন রায়ের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি ইসলামের মধ্যেই মানবতার পূর্ণাঙ্গ রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ফররুখ অনেক জনপ্রিয় গান লিখেছেন। তাঁর গান একসময় রেডিও ও টিভিতে নিয়মিত শোনা যেত। কিন্তু এখন আর শোনা যায় না। অথচ লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এরা প্রথমত তাঁদের গানের জন্যই বেঁচে আছেন। ফররুখ আহমদের গানের চর্চার মাধ্যমে তাঁকেও একজন জনপ্রিয় কবি হিসাবে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর আবৃত্তিযোগ্য অনেক সুন্দর কবিতা রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন। কিন্তু সে কাজটি করা হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে ফররুখের রচনাবলী সকলের জন্য সহজলভ্য করা প্রয়োজন। ফররুখ আহমদ তাঁর জীবন- দর্শন ও জীবনের সব স্বপ্ন-কল্পনা-অভীপ্সার প্রতিফলন রেখে গেছেন তাঁর লেখায়। অতএব, তাঁর লেখার মধ্যেই প্রকৃত ফররুখ আহমদকে অনুসন্ধান করতে হবে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আবৃত্তি ও নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর বসে। এটি পরিচালনা করেন ছড়াকার মানসুর মুজাম্মেল। এতে প্রায় দুই ডজনের অধিক তরুণ কবি অংশগ্রহণ করেন। পরের দিন ১৯ অক্টোবর বাদ জু'মা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কবির মাজার জিয়ারত করা হয়।

ঢাকাস্থ শাহজাহানপুরে কবি বেনজীর আহমদের আমবাগানে শায়িত কবি ফররুখ আহমদের মাজার জিয়ারতের দৃশ্য। কবি বেনজীর আহমদ ও ফররুখ আহমদ উভয়েই পাশাপাশি একই স্থানে চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন কবি বেনজীর আহমদের ছায়াঢাকা, পাখিঢাকা, শ্যামল আম্রকুঞ্জে।

সৌভাগ্যবান কবি ফররুখ আহমদ

মনিরুজ্জামান পলাশ

বিংশ শতকের মধ্য ত্রিশের দশক থেকে শুরু করে মধ্য সত্তর দশক অবধি মূলত ফররুখ আহমদের (১৯১৮-৭৪) সাহিত্য সাধনার কাল। এ অল্প সময়ে অগণন কবিতা লিখেছেন ফররুখ আহমদ। তার অধিকাংশ কবিতা কালকে অতিক্রম করে কালজয়ী হয়ে আজ পর্যন্ত সগর্বে টিকে আছে টিকে থাকবে। বাংলা কবিতা যতদিন মানুষের মন ও মননে অনুরণন তুলবে, ততদিন পর্যন্ত। কবি হিসাবে ফররুখ কতটা বড়, সেটা বিচারযোগ্য নয়। ফররুখ বাংলা কবিতা সৃষ্টিতে কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, সেটাই প্রকৃত বিচার্য বিষয়।

জাতি হিসাবে আমরা বরাবরই হীনমন্য? সার্বক্ষণিক হীনমন্যতায় ভুগি। ফররুখকে নিয়েও আমাদের এ হীনমন্যতার শেষ নেই। আমরা ফররুখের জীবদ্দশা থেকেই ভাবতে শুরু করেছি বাংলা কতিায় ফররুখের অবস্থান কী হবে? ফররুখ টিকে থাকবেন কি থাকবেন না? ফররুখের কবিতা এ দেশের মানুষ গ্রহণ করবে কি করবে না? গ্রহণ করলেও তা কতটুকু এবং কীভাবে? এসব নানাবিধ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরকে বড় বেশী প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছি। আর সত্যি কথা এই যে, এত সবের মধ্যেও ফররুখ দিনে দিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো প্রবলভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন। তাঁর কবিতাকে যতই আড়াল করার অপ্রয়াস চালানো হয়েছে, তত বেশী তা প্রকাশ্যে মানুষের

মন-মননে স্থান করে নিয়েছে চিরস্থায়ীভাবে। তা না হলে, তাঁর জন্মের প্রায় শতবর্ষ পরেও তিনি কেন আজও আমাদের চিন্তা-চেতনায়, আমাদের আনন্দ-বেদনায়, আমাদের জাতীয় দুর্দিনে দুঃসময়ে কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীন হন। কী সম্মোহনী শক্তি তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে যে, তাঁর জীবন এবং কবিতা থেকে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় জীবন পর্যন্ত উত্তরণ এবং মুক্তির পথ খুঁজি? খুঁজি একারণেই যে, ফররুখ আমাদের চিন্তা-চেতনায় অবিমিশ্রভাবে মিশে আছেন। আমাদের চেতনার ডালাপালা জুড়ে যেমন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, তেমনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই ফররুখের অবস্থান। এ অবস্থান শুধু আজ নয়, ফররুখের উদয়কালেই জ্ঞানপিপাসূ মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন-সাহিত্যের আকাশে এক নতুন সূর্যের বলয় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিশেষ করে কবিতা সম্পর্কে সে সময়ে সকলেরই একটি অতি উচ্চ ধারণা লক্ষ করা গেছে। ফররুখের কবিতা সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য করেন তাঁর সমসাময়িক কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ। ('সওগাত' ভাদ্র ১৩৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত আবু রুশদের প্রবন্ধ 'আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ')।

অবশ্য আবু রুশদ উত্তরকালেও ফররুখ আহমদ সম্পর্কে মূলবান মন্তব্য করেন। এখানে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আবু রুশদের মন্তব্য পুরোটাই উদ্ধৃতি করছিঃ "ফররুখ আহমদ- ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি, অর্থ্যাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক বাস্তব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁর কাব্যে সৌন্দর্যের জয়গান অকুণ্ঠ সুন্দরের প্রতি আকর্ষণও তার কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য। তবুও তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক। তাঁর একটি বলিষ্ঠ সজাগ তীক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন আছে যা সৌন্দর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করার সাহস রাখে। কিন্তু রোমান্টিকদের বিপদ সম্বন্ধে যা সর্বদা সচেতন। তাঁর মেধা এবং সুক্ষ্ম পরিমাণ জ্ঞান বিস্ময়কর এবং তাঁর বয়সের কবির রচনায় প্রত্যাশিত। শব্দের নিপুণ বয়নে, কল্পনার ব্যাপকতায় এবং গভীর অর্থে পরিস্ফুট রূপক-মাধুর্য্যে তার কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। কবি হিসাবে ফররুখ আহমদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা নিজের শক্তির উপর তাঁর আস্থার অভাব। তাঁর প্রকাশ ও দৃষ্টি-ভঙ্গী রোমান্টিক বলে কবি যেন একটু কুণ্ঠিত এবং এই কুণ্ঠার জন্যে অধিকাংশ কবিতা পরিপূর্ণরূপে রসোর্ত্তীণ হতে পারেনি। নিজের তৈরি যে কারাগারে কবির মন এমন বন্দী তা তাঁর কাব্য প্রচেষ্টাকে বহু জায়গায় ব্যর্থ করেছে। ফররুখ আহমদের যা সবচেয়ে বেশী জানা দরকার তা এই যে, বলিষ্ঠ রোমান্টিজিম বাস্তবিকই নিন্দার কিছু নয়। আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফররুখ আহমদের উপর যদি থেকে থাকে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সৃষ্টি কালের প্রথম পর্যায়েই ফররুখ প্রবলভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পাঠক সমালোচকের। তাঁর রচনার যে বিপুলতা ছিল তার তুলনায় অবশ্যই অপ্রতুল ছিল প্রকাশের। তবে তার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিভূ-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে পেরেছে, তিনি বারবার আলোচিত সমালোচিত, কখনো কখনো সমালোচিত থেকেছেন কিন্তু কখনো আলোচিত বা উপেক্ষিত থাকেননি।

এ কথা সত্য ফররুখ আহমদ তাঁর বিপুল বিশাল প্রতিভার সত্যিকার মূল্যায়ন হয়তো পাননি। তবে এ কথাও অস্বীকার করতে পারিনা জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে তনি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসমূহ পেয়েছেন। তার মানে কী, মানে বাহ্যিকভাবে আমরা তাঁকে যতটাই অবজ্ঞা করতে চাইনা কেন, আমাদের ভেতরের যে আমি অন্তর চক্ষু মেলে বসে আছে সে কিন্তু ফররুখের প্রবল শক্তিকে কখনো কোন অবস্থাতেই অবজ্ঞা-অবহেলা করেনা। করতে পারেনি। তাই শত প্রতিকূলতা পেরিয়েও ফররুখকে আমাদের জাতীয় প্রতিভূ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়নি।

ফররুখের কবি প্রতিকৃতি তাঁর সদা সফেদ পাঞ্জাবীর মতই আকর্ষণীয় উজ্জ্বাস। একজন প্রকৃত কবি হলো তাঁর সমাজের দিক নিদের্শক। অবশ্য কবি নিজে সমাজকে বদলে দিতে পারেন না কিন্তু তার সঠিক নিদের্শনা সমাজ এবং সভ্যতার গতি প্রকৃতিকে সুন্দুর করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। কবি কবিতা লেখেন মূলত বস্তুগত সমাজকে গড়েতে নয়। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলাই হলো কবির উদ্দেশ্যে। আর–মানবিক বোধের উন্নতি হলেই সমাজের সার্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

ফররুখ তাঁর সারা জীবনের কাব্য চর্চার মাধ্যমে নিজে যেমন পরিশুদ্ধ থেকেছেন তেমনি সমাজকে দেশকে জাতিকে শুদ্ধতার দিকে এগিয়ে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। উদ্বৃদ্ধ করেছেন নি:প্রাণ জাতিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন বোধের ঘরে আঘাত হানতে। তাই তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে-

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে
সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে,
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি,
রাত পোহাবার কতদেরী পাঞ্জেরী?
দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে
কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে?
একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর তুফান শ্রান্ত খাব

অস্ফুট হয়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী ।
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি,
রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

অবশ্য এ কথাও সত্য জাতিকে এগিয়ে নিতে মানুষের বোধকে জাগ্রত করতে গিয়ে কবি নিজেও আক্রান্ত হন। কবির সুমহান ডাককে সকলেই ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারবেনা। আর তখনি কবির বিপক্ষে কবিতার বিরুদ্ধে কিচু কিছু মানুষ আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠে এবং কবি কে নানা ভাবে আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত করে তোলে। শূদ্ধতম কবি সে আঘাতে ব্যথিত হন বটে তাই বসে সুন্দর আর সত্যের পথ থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হন না। ফররুখ আহমদ সেই মহান আর মহৎহতম কবি যিনি শত আঘাতেও সত্যের পথ সরিয়ে নেননি। দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর দায়-বদ্ধতার কথা কখনো তিনি ভুলে যাননি। আর ভুলে জাননি বলেই বিভ্রান্ত জাতিকে তিনি পথ দেখাতে পেরেছেন প্রতি মুহুর্তে–

কত যে আঁধার পর্দা সরায়ে ভোর হল জানিনা তা
নরাঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়র এনেছে ফেনা ।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি বেয়ে চেয়ে দেকো দুয়ারে ডাকে জাহাজ
আসল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ ।
হারে পানি নাই পাল তার ওড়ে নাকো
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্তী আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরয়িার যেন সে পূর্ণ চাঁদ
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে বলে ভেঙ্গে চলে সব বাঁধ ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকারে ঝরেছে হাসনা হেনা
এখানো তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না? তবু তুমি জাগলে না?
(সাত সাগরের মাঝি)

ফররুখের জীবদদ্দশাতে যেমন তাঁর সুখ্যাতির সীম ছিলনা তেমনি সমলোচনার শানিত তীর তাঁকে কস বিদীন করেনি। ১৯৪৩ সালে শনিবারের চিঠি পত্রিকায় ফররুখ আহমদের একটি কবিতা প্রসঙ্গে লেখা হয়।

" একেতো আধুনিক কবিতার জ্বালায় আমরা জ্বলিয়ে পুড়িয়া খাক হইয়া গেলাম, ইহার উপর আবার যদি 'মজলুমের নুনের ছিটা এমন নৃশংসভাবে দেয়া হয়। তাহা হইলে ডেস্টিউট' হইয়া মরিয়া যাওয়াই ভালো। এক অমিয় চক্রবর্তীর ঠেলা সামলাতেই আমাদিগকে হিমসিম খাইতে হইতেছে, আবার ফররুখ আহমেদ যদি দিল্লাঙ্গা মুরু করেন আমরা যাই কোথায় অগ্রহায়ণের 'মাসিক মোহম্মদী'র মুখপাত্রের কবিতা 'মজুলম' যেন সমস্ত মুসলমান সমাজের গভীর র্তনাদের মতন শুনাইতেছে; তোমরা তো এতদিন মুক্ত ছিলে ভাই, শেষ পর্যন্ত তোমরাও মজিলে?

এই উৎপীড়িত হাড়, বুভুক্ষু জিন্দিগী আর পদগিষ্ঠ ছিনা
আজ শুধু তোমাদের করে যাবে ঘৃণা;
উত্তপ্ত লেলিহ ধোঁয়া বুকে তার উৎপীড়িত রাত্রি হবে ভোর
সে আগুন জ্বালানোর দুর্বার জেহাদে
এ অভিশাপ যে আধুনিক কবিতা পীড়িত আমাদেরই উচ্চার্য্য ।'

বিরুপ সমালোচনা ফররুখের হয়তো ক্ষতবিক্ষ কিছুটা করেছে তবে কিছুতেই তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। আর ভেঙ্গে না পড়ার প্রাচীনতম কারণ, ফররুখ মানসিক ভাবে অত্যন্ত দৃঢ় চেতনার এক শক্তিমান পুরুষ। কখনো কোন অবস্থাতেই তিনি ভেঙ্গে পড়তে শেখেন নি। শত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও নিজের প্রতি অবিচল বিশ্বাসে স্থীর থেকেছেন এবং সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে আপন আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। সে কারণে তিনি পার্থিব প্রয়োজনে হয়তোবা পিছিয়ে পড়েছেন খানিকটা কিন্তু মনের সিংহাসেরন সবসময় তিনি থেকেছেন রাজাধিরাজ। আর সেই দৃতো তিনি তাঁর কবিতার শরীর সরল ভাবে প্রয়োগ করেছেন বরং উচ্চমানের শিলেপর সংরাগে। যে কারণে তার প্রথম গ্রন্থেই তিনি কবিতার আকাশকে নিজের বুপকেট সযত্নে ভরে ফেলতে পেরেছেন।

১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' জয়নুল আবেদীন এম, এ এই বই এর আলোচনায় লেখেন: 'তরুণ কবি ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি' তাঁর কবি জবিনের প্রথম প্রসূন। শুধু ভাল ভাব ও ভাষাতেই যে তা নতুন এমন নয়, দৃষ্টি এবং শিল্প নৈপুন্যেও তা নতুনত্বের দাবী জানায়। প্রতিভার সবলতা ও উৎকর্ষের সুস্পষ্ট একটি ছাপ ফুটে উঠেছে কাব্যখানির আগাগোড়ায়' (মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২)

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বসুধা চক্রবর্তী লেখেন (আংশকি উদ্ধৃত্তি) 'বইটির প্রতি কবিতারই রসাবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। কথা উঠবে আরবি ফারসি শব্দের অত্যাধিক ব্যবহার নিয়ে, কিন্তু

সম্পূর্ণ ভাবযোজনার জন্যে বোধ হয় তার দরকার ছিল। কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে, ঐ শব্দগুলির মানে আলাদা লিখে দিলে ভালো হতো। তা হয়তো কিছুটা হতো, কিন্তু শুধু আলাদা অর্থ পড়ে ভাবের সম্পূর্ণ অনুষঙ্গ বোঝা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বীকার করতেই হবে যে, সুস্থ সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় নতুন এক সমস্যা জেগে উঠেছে। ভাষার দ্বিত্বের সম্ভাবনাও একেবারে অলীক নয়। কিন্তু সে বিচারে বর্তমান কাব্য প্রসঙ্গকে বিড়াম্বিত করাবার প্রয়োজন নেই। বাংলার সুন্দরতম পল্লীতেও আজ মুসলমান আত্মোপদ্ধিতে পেতে চাইবে নতুন প্রাণ। তার সঙ্গে বাস্তব সংযোগ যার আছে তার এখবর জানা আছে। তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাবার প্রয়োজন প্রতি বাঙ্গালীর, যদিও এ প্রয়োজন এখনও বেশী লোকের উপলদ্ধিগত নয়। ফররুখের কাব্যে তার মর্মগত পরিচয়; এ কাব্যে আছে, গভীর বিত্তোদ্ভূত রস-সমৃদ্ধি।' (সওগাত, বৈশাখ ১৩৫২)

যে সমস্ত কবিদের কবিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বক্ষণ অনুরনন তোলে, উদ্ধৃত হয় জীবনের নানা প্রয়োজনে সময়ের অসময়ে সেইসব সৌভাগ্যবান কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদ অবশ্যই অনন্য। তাঁর সব কবিতা না হলেও এমন কিছু কালজয়ী কবিতারয়েছে যার আবেদন কখনো কিছুতেই ফুরিয়ে যাবার নয়। ঝর্না ধারার মত ফররুখের কবিতা অবিশ্রান্ত ঝরবে মানুষের অস্থির আর অশান্ত মনের উঠোনে এবং সেই কবিতার শীতল স্পর্শে। মানুষের অস্থির মন হয়ে উঠবে সতেজ শ্যামল, মানুষ জাগ্রত হবে- জাগ্রত হবে তার ঘুমিয়ে পড়া বিবেক। একজন প্রকৃত সার্থক কবির প্রধান কাজইতো হলো তাই–

আমরা এসেছি পথে, জীবনের সদৃঢ় সড়কে
সেখানে প্রতিটি ইটে সুকঠিন তোমার প্রয়াস
প্রতি পাথরের মূলে যেখানে তোমার তপ্ত শ্বাস ৎ
রক্তক্ষরা স্বেদবিন্দু ভেসে ওঠে বোখের পলকে।

একদিন সে কল্পনা নেয়েছিল বিদ্যুৎ ঝলকে
তোমরা নিবিড় ধ্যানে গড়েছে সে এই ইতিহাস
এ পথেদাঁড়িয়ে শুনি ঐতিহ্যের উদার আশ্বাস
(সুবে উম্মীদের দীপ্তি জেগে ওঠে উন্মুক্ত আলোকে)।

কত তন্দ্রাহীন রাত্রি কেটেছে তোমার নিরলস,
শ্রান্তিহীন দিনগুলি কেটে গেছে একাগ্ন তোমার
তিক্ততম সাধনায়। পেয়েছো বিদ্রুপ উপেক্ষার;

পেয়োছো লাঞ্ছনা, ঘৃনা, সুনির্মম, বিশ্বাদ, বিরস
চাওনি সুলভ খ্যতি (সন্তস্ত করেনি অপযশ)
তেমাকে মর্যদা দিয়ে পাই আমি পাথেয় আমার।
(পূর্বসূরীর প্রতি: মুহূর্তের কবিতা)

ওগো পাঞ্জেরীর কবি
- মীর্যা সিকান্দার

ওগো পাঞ্জেরীর সুমহান কবি"
কাব্য আকাশের প্রদীপ্ত রবি,
মোদের ছেড়ে
গেছ বহুদূরে
প্রেরণার যা
দিয়ে গেছ সবি।
কবিতা তোমার আল্লাহ-প্রেম-দীপ্ত
স্বাধীকারের চেতনা সংলিপ্ত
পাবে তা সতত
বঞ্চিত হৃদয়
সহসা যে
হতে পারে তৃপ্ত।
নেই আজ নজরুল ইসলাম, নেই আজ তুমি
যালিমের যুলুম তপ্ত এ ভূমি,

প্রতিটি নিমেষ
কাটে আমাদের
নরপশুদের খুন-রাঙ্গা
পাও তুমি ।
কে করবে যুলমের প্রতিবাদ আজ
কে পরাবে জাতিকে রণরঙ্গ সাজ
কে যোগাবে
ছন্দের দোলায় হিম্মত
ভাংতে রুদ্ধকারার
লৌহ কবাট ।

কবি ফররুখ আহমদের অপ্রকাশিত কবিতা

রমজান

ফররুখ আহমদ

আসিল রমজান মুবারক নিখিল জাহানে ফিরে
বাঁকা ঐ চাঁদের রেখা দেখি যে বনানী শিরে ।।
পাপের দহনে ধরা ছিল যে মুর্ছাহত
খোদার রহম আজি নামিল ধরণী ঘিরে ।।
পাপী ও তাপীরে দিতে বারতা জান্নাতেরি
ক্ষমা ও দয়ার বাণী আনিল প্রাণের তীরে ।।
সাধনা সংযমেরী এমাসে পুণ্য কামী
জাগে যে নারী ও নর বেদনা অশ্রু নীরে ।।
কে আছো মুক্তিকামী পাপের কুহক জালে
হে সাধক এস উঠে আনত চিত্তে ধীরে ।।

[কবিতাটি কবিপুত্র আখতার আহমদের কাছ থেকে প্রাপ্ত । প্রকাশঃ রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত সাময়িকী আলহেলাল/৭৮ সাময়িকীতে প্রথম প্রকাশ । সম্পাদনায় কবি আশরাফ জামান ।]